সৌদী আরব, জর্দান ও সিরিয়ার
ঐতিহাসিক সফর নামা

উহুদ থেকে কাসিয়ুন

জাস্টিস মাওলানা মুহাম্মাদ তাকী উসমানী

Contents

আমার দেখা পৃথিবী-২

উহুদ থেকে কাসিয়ুন

[সৌদি আরব, জর্দান ও সিরিয়ার
ঐতিহাসিক সফরনামা]

মূল

শাইখুল ইসলাম মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী
(দামাত বারাকাতুহুম)

অনুবাদ

মাওলানা মুহাম্মাদ জালালুদ্দীন
মুদাররিস ঃ টঙ্গি দারুল উলূম মাদরাসা
ইমাম ও খতীব ঃ আল বাইতুল মা'মুর জামে মসজিদ
আহালিয়া, উত্তরা, ঢাকা

(অভিজাত মুদ্রণ ও প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান)
ইসলামী টাওয়ার (দোকান নং-৫)
১১/১, বাংলাবাজার, ঢাকা-১১০০

Contents

সূচীপত্র
উহুদ থেকে কাসিয়ুন

Contents

॥ ॥ ॥

উহুদ থেকে কাসিয়ুন

[সউদী আরব, জর্দান ও সিরিয়া সফর]

সফরকাল ঃ রবিউল আওয়াল ১৪০৬ হিজরী
মোতাবেক জানুয়ারী ১৯৯৬ ঈসায়ী

فرنگیوں کو عطا خاکِ سُوریا نے کیا
نبیِ عفت و غم خواری و کم آزاری
صِلہ فرنگ سے آیا ہے سُوریا کے لیے
مے و قمار و ہجومِ زنانِ بازاری

সিরিয়ার মাটি ইউরোপকে পুত–পবিত্র নবী
সমবেদনা ও ভালোবাসা উপহার দিয়েছিল।
প্রতিদানে ইউরোপ থেকে সিরিয়ার জন্য
মদ, জুয়া আর বাজারী নারীদের সয়লাব এসেছে।

উহুদ থেকে কাসিয়ুন

১৯৫৬ খৃষ্টাব্দে আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মাদ শফী সাহেব (কুদ্দিসা সিররুহু) সিরিয়া গমন করেন। সে সময় থেকে সিরিয়া দেখার প্রচণ্ড বাসনা আমার অন্তরে ছিল। সিরিয়া আম্বিয়ায়ে কেরামের ভূখণ্ড। পবিত্র কুরআনে জায়গায় জায়গায় তার পবিত্রতা ও বরকতসমূহের আলোচনা করা হয়েছে। হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর যুগ থেকে তার সঙ্গে ইসলামী ইতিহাসের অবিস্মরণীয় ঘটনাবলী বিজড়িত। সিরিয়ার যে সকল অধিবাসীর সঙ্গে আমার সাক্ষাত হয়েছে, তাদেরকেও স্বদেশের প্রশংসায় পঞ্চমুখ পেয়েছি। তাদের আকৃতি প্রকৃতিতে সিরিয়ার সৌন্দর্য উদ্ভাসিত দেখতে পেয়েছি। তাই একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, পবিত্র মক্কা ও মদীনার পর বিশ্বের যেই ভূখণ্ড দেখার আগ্রহ আমার সর্বাধিক ছিল, তা হলো সিরিয়ার ভূখণ্ড।

এ বছর রবিউল আউয়াল মাসে মাজমাউল ফিকহিল ইসালামীর বার্ষিক অধিবেশন জিদ্দাতে অনুষ্ঠিত হচ্ছিল। সম্মেলন শেষে সিরিয়া ভ্রমণের ইচ্ছা আমার পূর্ব থেকেই ছিল। আমার ভাগ্নে মৌলবী আমীন আশরাফ সাল্লামাহুও (যিনি মদীনা তাইয়্যেবার হাই কোর্টের একজন অফিসার) এই সফরে অধমের সফরসঙ্গী হঁওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। শ্রদ্ধেয় ভ্রাতা জনাব কারী বশীর আহমাদ সাহেব পূর্ব থেকেই এই সফরের জন্য প্রস্তুত ছিলেন। আর তাৎক্ষণিকভাবে আমার ভাগ্নি জামাই মৌলবী আতাউর রহমান সাহেবও (যিনি একজন সৌদী নাগরিক) সঙ্গে যাবার জন্য প্রস্তুত হন। তাদের সকলের মত এ ভ্রমণ সড়ক পথে করবে। মৌলবী আতাউর রহমান সাহেব সে সময় একটি নতুন গাড়ীও ক্রয় করেছিল, তাই সেই গাড়ী যোগেই ভ্রমণ করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি। এভাবে আমাদের ছোট একটি কাফেলা তৈরী হয়ে যায়। এ সকল ব্যক্তির সাথে এ সফরটি অত্যন্ত চমকপ্রদ হয় এবং আনন্দে কাটে।

যে দিন আমরা সকাল সাড়ে সাতটার সময় মদীনা তাইয়্যেবা থেকে কারযোগে যাত্রা করি সে দিন ছিল ১৯৮৬ খৃষ্টাব্দের প্রথম দিন, অর্থাৎ জানুয়ারী মাসের প্রথম তারিখ। উহুদ পাহাড়ের পশ্চিম দিক হয়ে আমরা

সিরিয়াগামী সড়কে এসে পৌঁছি। সড়কটি মদীনা তাইয়্যেবার উত্তরে খাইবার, মাদায়েনে সালেহ এবং তাবুক হয়ে জর্দান সীমান্ত পর্যন্ত পৌঁছেছে।

মদীনা তাইয়্যেবা থেকে বের হওয়ার পর সড়কের উভয় পাশে বহু দূর পর্যন্ত বিস্তৃত পাথুরে পাহাড় দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। এই সেই পথ, যে পথে আরবের মরুবাসীদের কাফেলা সিরিয়ায় যেত। স্বয়ং উভয় জাহানের সরদার হযরত মুহাম্মাদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অন্তত পক্ষে চার বার এই পথে গমন করেছেন। দু'বার নবী হওয়ার পূর্বে সিরিয়া গমনের জন্য, একবার খাইবার আক্রমণের জন্য এবং একবার গাযওয়ায়ে তাবুকের সময়। পাথরের এই পাহাড়গুলো মানবেতিহাসের পবিত্রতম ব্যক্তিবর্গের জগতশ্রেষ্ঠ রূপ অবলোকন করেছে। তারা উভয় জগতের সরদার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামের পদচুম্বন করার সৌভাগ্য অর্জন করেছে। কল্পনার চোখে সে সব পাহাড়ে প্রান্তরে মানবতার মুক্তিদাতাদের কাফেলাসমূহ এবং তাদের অশ্ব ও উষ্ট্রসমূহের চড়াই উৎরাই অতিক্রম করা প্রত্যক্ষ করতে থাকি। সে সব কল্পনা এই সফরে পর্যটনের (আনন্দের) চেয়ে অধিক ভক্তি, ভালবাসা ও পবিত্রতার রং সৃষ্টি করে।

প্রায় তিন ঘন্টার অনবরত ভ্রমণের পর বড় একটি জনবসতির নিদর্শন শুরু হয়। সঙ্গীরা জানালেন এটিই খাইবার। খাইবারের নতুন জনবসতি প্রধান সড়কেই অবস্থিত। কিন্তু খাইবারের পুরাতন অঞ্চলে যাওয়ার জন্য প্রধান সড়ক থেকে কিছু দূর সরে যেতে হয়। আমি ছাড়া আমার সকল সঙ্গীই ইতিপূর্বে খাইবার এসেছেন। তাই তাদের সাথে অভীষ্ঠ স্থানে পৌঁছতে কোন সমস্যা হয়নি। কেন্দ্রীয় মহাসড়ক থেকে কয়েক মাইল সরে গিয়ে আমরা খাইবারের প্রাচীন বস্তিতে পৌঁছি। বস্তিটি নিবিড় খেজুর বাগানের মাঝখানে অবস্থিত। তার উঁচু নিচু গলিপথ প্রাচীনতার উপাখ্যান শুনায়। কাঁচা পাকা পথ অতিক্রম করতে করতে আমরা জীর্ণ একটি দূর্গ প্রাচীরের নীচে পৌঁছি। দূর্গটি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগ থেকে অদ্যাবধি চলে আসছে। পূর্বে লোকেরা

প্রাচীরে আরোহণ করে এর ভিতরেও চলে যেত। কিন্তু বর্তমানে এটি অত্যধিক জীর্ণ শীর্ণ হয়ে ভগ্নোন্মুখ হয়ে পড়ায় এখন আর এতে আরোহণের অনুমতি নেই।

খাইবার

খাইবার মূলতঃ কয়েকটি দূর্গসম্বলিত প্রশস্ত ও উর্বর একটি অঞ্চল। কথিত আছে যে, আমালেকা গোত্রের খাইবার নামক একটি লোক এটি আবাদ করে। তাই তার নামেই এ অঞ্চলের নাম প্রসিদ্ধ হয়ে যায়। কেউ কেউ বলেন, ইরানী ভাষায় দূর্গকে খাইবার বলে, আর যেহেতু এখানে একটি দূর্গ নির্মাণ করা হয়েছিল, তাই একে খাইবার বলা হত। পরবর্তীতে এখানে আরো দূর্গ নির্মাণ করা হয়। দূর্গগুলো নায়েম, কামুছ, নিতাত, কাছারাহ, আলওয়াতিহ এবং আসসালালেম নামে প্রসিদ্ধ ছিল। যে কারণে এ সমগ্র অঞ্চলকে 'খায়াবের' (খাইবারের বহুবচন)ও বলা হতো।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগে এ সম্পূর্ণ অঞ্চলে ইহুদীদের কর্তৃত্ব ছিল। তাদের বিভিন্ন গোত্র বিভিন্ন দূর্গে নিজেদের ছোট ছোট রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে রেখেছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হিজরতের পর থেকে এসব লোক মুসলমানদের বিপক্ষে অনবরত ষড়যন্ত্র করতে থাকে। মদীনার ইহুদীদের মধ্য থেকে বনু নযীর গোত্রকে পবিত্র মদীনার সঙ্গে চুক্তিভঙ্গের কারণে দেশান্তর করে দেওয়া হলে তারাও এখানে এসে বসতি স্থাপন করে। এখানে এসেও তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিপক্ষে চক্রান্তের জাল বুনতে থাকে। খন্দকের যুদ্ধে আরবের অনেক গোত্রের সম্মিলিত আক্রমণের পিছনেও তাদের বিরাট ভূমিকা ছিল। তারা সম্পদশালী হওয়ায় এবং প্রতিরক্ষার দিক থেকে যথেষ্ট শক্তিশালী থাকায় খাইবার ইসলামের জন্য সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিল। তারা মদীনা তাইয়্যেবার জন্য বহুরকম সমস্যা সৃষ্টি করে রেখেছিল। তাদের উপর চূড়ান্ত আঘাত করা ছাড়া এর প্রতিকার সম্ভব ছিল না।

হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং সাহাবায়ে কেরামকে উমরা আদায় না করে ফিরতে হয়, তখন এ

ঘটনায় তাঁদের অন্তর বড় মর্মাহত ছিল। সে সময় পবিত্র কুরআন তাঁদের সুসংবাদ প্রদান করা হয় যে, (তাদের এই ধৈর্য ও সহ্যের পুরস্কারস্বরূপ) আল্লাহ পাক অতিসত্বর তাঁদেরকে আরো একটি ভূখণ্ডের বিজয় দানে ভূষিত করবেন। সে ভূখণ্ড দ্বারা খাইবার–এর ভূখণ্ডই উদ্দেশ্য ছিল।

সুতরাং সপ্তম হিজরী সনের মুহাররম মাসে হুদাইবিয়া থেকে প্রত্যাবর্তনের আনুমানিক দেড় মাসান্তেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মুসলিম সেনাবাহিনীকে সঙ্গে করে খাইবার বিজয়ের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। বিভিন্ন হাদীসে বর্ণিত হয়েছে যে, আসর নামাযের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের অদূরে 'সাহবা' নামক স্থানে পৌছেন। 'সাহবা' ছেড়ে সম্মুখে অগ্রসর হলে খাইবারের ভবনসমূহ দৃষ্টিগোচর হয়। সে সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেনাবাহিনীকে দাঁড় করিয়ে নিম্নোক্ত দু'আ পাঠ করেন—

اللهم انا نسألك خير هذه القرية و خير اهلها و خير ما فيها ، و نعوذبك من شر ها و شرأهلها و شر ما فيها -

"হে আল্লাহ! আমরা আপনার সকাশে এ জনপদ, এর অধিবাসীদের এবং এর যাবতীয় বস্তুর কল্যাণ কামনা করছি। আর এর যাবতীয় অনিষ্ট থেকে আশ্রয় প্রার্থনা করছি।"

এই হাদীসের বর্ণনাকারী বলেন ঃ নতুন কোন জনপদে প্রবেশকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাধারণতঃ এই দু'আ পাঠ করতেন।

পরদিন ভোরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবারের নায়েম নামক দূর্গ আক্রমণ করেন। এই আক্রমণে হযরত মুহাম্মদ বিন মুসলিমাহ (রাযিঃ) দুরন্ত সাহসিকতার সাথে লড়তে থাকেন। কিন্তু এক সুযোগে জনৈক ইহুদী দূর্গের উপর থেকে যাঁতার এক অংশ তাঁর উপর নিক্ষেপ করলে তিনি শহীদ হয়ে যান। এরপর অতি দ্রুত দূর্গ জয় হয়ে যায় এবং পরপর আরো কয়েকটি দূর্গ জয় হতে থাকে। তবে প্রচণ্ড সংঘর্ষ হয় কামুছ দূর্গ জয় করতে। সে দূর্গের পাদদেশেই আমরা এখন দাঁড়িয়ে।

প্রতিরক্ষা ব্যবস্থার দিক থেকে খাইবারের এই দূর্গটিকে সর্বাপেক্ষা মজবুত দূর্গ মনে করা হত। শত্রুপক্ষও তাদের সকল সামরিক শক্তি এখানেই ব্যয় করেছিল। প্রায় বিশ দিন এই দূর্গের অবরোধ অব্যাহত থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পর পর কয়েকজন সাহাবীকে এতে আক্রমণের উদ্দেশ্যে প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁদের হাতে দূর্গ জয় হয়নি, তাঁরা দূর্গ জয় না করেই ফিরে আসেন। পরিশেষে একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করলেন ঃ আমি এমন এক ব্যক্তির হাতে ঝাণ্ডা প্রদান করব, যে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলকে ভালবাসে এবং আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলও তাঁকে ভালবাসেন। ইনশাআল্লাহ আল্লাহ তাআলা তাঁর হাতে দূর্গের বিজয় দান করবেন।

এ ঘোষণা শোনার পর প্রত্যেকে প্রতীক্ষায় ছিলেন, কার কপালে জোটে এই মহাসৌভাগ্য। সাহাবায়ে কেরামের সে রাত্র অত্যন্ত আবেগ ও প্রতিক্ষার মধ্য দিয়ে অতিবাহিত হয়। সেদিন প্রত্যুষে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আলী (রাযিঃ)কে ডেকে তাঁর হাতে পতাকা অর্পণ করলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই মনোনয়নে সাহাবায়ে কেরাম বিস্ময়াভিভূত হন। কারণ হযরত আলী (রাযিঃ) তখন চোখের পীড়ায় আক্রান্ত ছিলেন। কোন কোন বর্ণনায় আছে যে, হযরত আলী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি চোখের ব্যথায় আমার পা পর্যন্ত দেখতে পাচ্ছি না। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের পবিত্র লালা তাঁর চোখে লাগিয়ে দেন এবং দূ'আ করেন। ফলে সাথে সাথে তাঁর চোখ ভাল হয়ে যায়। হযরত আলী (রাযিঃ) পতাকা হাতে সম্মুখে অগ্রসর হন এবং দূর্গের পাদদেশে পতাকা উড়িয়ে দেন।

নামকরা ইহুদী পালোয়ান মুরাহহাব রণসঙ্গীত গাইতে গাইতে যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়। হযরত আলী (রাযিঃ) তার সাথে মোকাবেলায় অবতীর্ণ হন। এক পর্যায়ে হযরত আলী (রাযিঃ) উন্মুক্ত অসি দ্বারা তার মাথায় আঘাত করেন। ফলে তার মাথা দ্বিখণ্ডিত হয়ে যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ভবিষ্যদ্বাণী মোতাবেক দূর্গ তাঁর হাতেই জয় হয়।

এটিই সেই দূর্গ, যার দরজা উপড়ে ফেলার কাহিনী 'দরে খাইবার'

নামে মানুষের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে। বলা হয় যে, হযরত আলী (রাযিঃ)এর ঢাল যুদ্ধাবস্থায় তাঁর হাত থেকে পড়ে যায়। তখন তিনি দুর্গের ফটক উপড়ে ফেলে হাতে তুলে নেন এবং ঢালস্বরূপ ব্যবহার করেন। কিন্তু বর্ণনাটি নিতান্তই দুর্বল ও অনির্ভরযোগ্য। মুহাদ্দিসীনে কেরাম কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন।

কামুছ দূর্গ জয়ের পর শত্রুপক্ষের মেরুদণ্ড ভেঙ্গে পড়ে। তারপর ‘অতীহ’ ও ‘সালালিম’ দূর্গ বিনা যুদ্ধে জয় হয়। ইহুদীরা অস্ত্র সমর্পণ করে সন্ধি করে।

এ দূর্গটি বর্তমানে ছোট ছোট দুর্বল পাথরের নির্মিত এবং একটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। তার প্রাচীর একেবেঁকে বহু দূর পর্যন্ত চলে গেছে। উপরের অংশে প্রাচীনকালের নির্মিত কিছু ভবন পরিলক্ষিত হয়। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, এর নির্মাণ ধাচ ও অন্যান্য বস্তু খুব কমই পরিবর্তিত হয়েছে।

দূর্গের একপ্রান্তে বেষ্টনিতে ঘেরাও এর মত একটি পাকা জায়গা আছে। একটি খিড়কী পথে তার ভেতরাংশ দেখা যায়। প্রসিদ্ধ আছে যে, এ স্থানে গাধার গোশত হারাম হওয়ার কথা ঘোষণা করা হয় এবং গাধার গোশত পাকানোর জন্য যেসব ডেগ চুলায় চড়িয়েছিল, এ ঘোষণার ফলে তা উল্টিয়ে ফেলে দেওয়া হয়। হাদীস গ্রন্থে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে উল্লেখ আছে।

ঘেরা দেওয়া এই স্থান সম্পর্কে উল্লেখিত বিষয় সঠিক হলে এটিই যে কামুছ দূর্গ সে বিষয়েও সাক্ষ্য পাওয়া যায়। কেননা বিভিন্ন হাদীসে গাধার গোশত হারাম হওয়া এবং ডেগ উল্টে ফেলার ঘটনা কামুস দূর্গ বিজয়ের পরই বর্ণনা করা হয়েছে।

দূর্গের সম্মুখ দিয়ে ছোট পায়ে হাঁটা পথ একেবেঁকে অনেক দূর পর্যন্ত চলে গেছে। তার উভয় দিকে ছোট ছোট খেজুর বাগানের প্রাচীর। বর্তমানে এসব খেজুর বাগান অনাবাদ ও বিরান পড়ে আছে। তবে তার মধ্যে এখনও অনেক খেজুর গাছ আছে। এর মধ্যে একটি নহর প্রবাহিত রয়েছে। নহরটি সামনে গিয়ে একটি বড় পুকুরে পরিণত হয়েছে। পুকুরটি এখানে ‘আইনে আলী’ (রাযিঃ) নামে প্রসিদ্ধ। খুব আবেগ উৎসাহ নিয়ে

মানুষ তার পানি পান করে থাকে। বাস্তবে পানিও খুব ঠাণ্ডা, পরিষ্কার, স্বচ্ছ এবং মিষ্টি। কিন্তু এ ঝর্ণাকে হযরত আলী (রাযিঃ)এর সঙ্গে সম্পৃক্ত করার কোন কারণ অধম জানতে পারেনি। আবদুল্লাহ আল বকরী মুরহহাবের দূর্গের সন্নিকটে একটি ঝর্ণার কথা উল্লেখ করেছেন। একে 'কিসমাতুল মালাইকা' বলা হত। কিন্তু এটিকে তিনি হযরত আলী (রাযিঃ)এর দিকে সম্পৃক্ত করেননি। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আমরা কিছু সময় বিরান খেজুর বাগানে এবং খাইবারের প্রাচীন জনপদে অবস্থান করি। তারপর প্রধান সড়কের দিকে ফিরতি যাত্রা করি। খাইবারের প্রাচীন জনপদ থেকে কয়েক কিলোমিটার অতিক্রম করার পর ডানদিকে একটি পাহাড় পড়ে। এ পাহাড়টি 'সাদ্দুস সাহ্বা' নামে প্রসিদ্ধ। অর্থাৎ এটি সেই স্থান যেখানে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার আক্রমণের পূর্বে সন্ধ্যার সময় অবস্থান করেন। এবং খাইবার থেকে পবিত্র মদীনায় ফেরার পথে এখানেই উম্মুল মুমিনীন হযরত ছফিয়া (রাযিঃ)কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিবাহ করেন।

হযরত ছফিয়া (রাযিঃ) বনু নযীর গোত্রের সর্দার হুয়াই বিন আখতাবের কন্যা এবং কামুছ দূর্গ প্রধান কিনানার স্ত্রী ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার আক্রমণ করার মাত্র কিছুদিন পূর্বে এক রাত্রে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, একটি চাঁদ ইয়াসরিবের (মদীনা) দিক থেকে যাত্রা করে তাঁর ক্রোড়ে এসে পড়ল। তিনি তাঁর স্বামীর নিকট স্বপ্ন ব্যক্ত করলে তাঁর স্বামী তাঁকে প্রচণ্ড জোরে এক চপেটাঘাত করে বলে, তুমি ইয়াসরীব (মদীনা)–সম্রাটের স্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখছ। তার পরপরই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কামুছ দূর্গ জয় করেন। সে যুদ্ধেই কিনানা মৃত্যুবরণ করে। হযরত ছফিয়া (রাযিঃ) যুদ্ধবন্দী রূপে ধৃত হন। সাহাবায়ে কেরাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিবেদন করেন যে, ইনি এক সর্দারের মেয়ে এবং আরেক সর্দারের স্ত্রী। তাই তাঁকে অন্য কারো দাসী না বানিয়ে আপনি আপনার দাসী বানিয়ে নিন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামতাঁকে ডেকে নিয়ে বললেন ঃ তুমি তোমার ধর্মে থাকতে চাইলে আমরা তোমাকে ধর্মান্তরে বাধ্য করব না। তবে তুমি যদি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে গ্রহণ কর

তাহলে এটি তোমার জন্য উত্তম হবে। তখন হযরত ছফিয়া (রাযিঃ) ইসলাম গ্রহণ করেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ তুমি ইচ্ছা করলে তোমাকে মুক্ত করে দিয়ে তোমার গোত্রের নিকট পাঠিয়ে দেব। তুমি তাদের সঙ্গেই থাকবে। আর তুমি ইচ্ছা করলে মুক্ত করে দিয়ে আমি তোমাকে বিবাহ করব। তখন হযরত ছফিয়া (রাযিঃ) দ্বিতীয় পন্থাই গ্রহণ করেন। এভাবে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সহধর্মিনী হওয়ার সৌভাগ্য অর্জন করেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহবাতে তিনদিন অবস্থান করেন এবং এখানেই হযরত ছফিয়া (রাযিঃ)কে বিবাহ করার ওলীমার কাজ সম্পন্ন হয়। ওলীমার ধরনও ছিল বড় ব্যতিক্রম। চামড়ার একটি দস্তরখান বিছানো হয়। তারপর হযরত আনাছ (রাযিঃ)কে হুকুম করেন, 'ঘোষণা করে দাও, যার নিকট যা আছে নিয়ে এস।' কেউ খেজুর আনল, কেউ পনির, কেউ ছাতু আর কেউ বা ঘি। এভাবে কিছু সামগ্রী একত্র হলে সকলে বসে তা আহার করেন। গোশত বা রুটি তাতে ছিল না।

সাহবা অতিক্রম করে আমরা পুনরায় সেই পথে চলতে থাকি। যে পথ সিরিয়াগামী মহাসড়কে গিয়ে মিলিত হয়েছে। পথিমধ্যে একটি চড়াইয়ের ডান দিকে ঘেরাও করা একটি প্রশস্ত স্থান দেখতে পেলাম। সঙ্গীরা বললেন, এটি খাইবার যুদ্ধের শহীদদের মাযার। আমরা কিছুক্ষণের জন্য সেখানে অবতরণ করলাম। ওয়াফাদার শহীদদের খেদমতে সালাম পেশ করলাম। বিভিন্ন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, খাইবার যুদ্ধে প্রায় বিশজন সাহাবী শাহাদাত বরণ করেন।

এসব শহীদদেরই অন্যতম ছিলেন হযরত আসওয়াদ রায়ী (রাযিঃ)। তিনি ইসলাম গ্রহণের পর একবারও একটি নামাযও আদায় করার সুযোগ পাননি। কিন্তু হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সুসংবাদ অনুপাতে তিনি সোজা জান্নাতে চলে গেছেন। তার ঘটনা নিম্নরূপ ঃ

তিনি খাইবারের একজন রাখাল ছিলেন। পারিশ্রমিক নিয়ে ছাগল চরাতেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার অবরোধ করলে একদিন তিনি দূর্গবাসীদের নিকট যুদ্ধের প্রস্তুতির কারণ জানতে চাইলেন। তারা জানাল ঃ নবুওয়াতের দাবীদার এক লোকের সঙ্গে

মোকাবেলা হবে। তাঁর মনে এই নবীর সঙ্গে সাক্ষাত করার ইচ্ছা জাগল। একদিন তিনি ছাগল চরানোর জন্য দূর্গের বাইরে চলে আসেন। সম্মুখে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সৈন্যবাহিনী শিবির স্থাপন করেছিল। তিনি সরাসরি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের খেদমতে পৌছলেন। ইসলাম সম্পর্কে বিভিন্ন কথা জানলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাকে ইসলামের বুনিয়াদী বিষয়গুলো অবহিত করলেন। তাঁর হৃদয়ে ইসলামের ভালবাসা জন্মালো। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, আমি ইসলাম কবুল করলে কি পুরস্কার পাব? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ জান্নাত। তিনি বললেন, আমি একজন কৃষ্ণবর্ণ বদসুরত মানুষ। আমার শরীর থেকে দুর্গন্ধ আসছে। তবুও আমি ইসলাম গ্রহণ করলে জান্নাতের হকদার হব কি? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ হাঁ। আল্লাহ পাক তোমাকে সুন্দর চেহারা দান করবেন এবং তোমার দেহের দুর্গন্ধ সুগন্ধে পরিণত করবেন।

একথা শ্রবণ করে আসওয়াদে রায়ী ইসলাম কবুল করলেন এবং বললেন ঃ ছাগলগুলো আমার নিকট আমানত। এগুলো কি করব? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ ওগুলোকে দূর্গের দিকে হাঁকিয়ে দাও। সুতরাং তিনি ছাগলগুলো দূর্গের দিকে হাঁকিয়ে দিলে সেগুলো দূর্গের অভ্যন্তরে চলে যায়। তারপর আসওয়াদে রায়ী (রাযিঃ) খাইবারের যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। যুদ্ধ শেষ হলে শহীদদেরকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সম্মুখে আনা হল। তার মধ্যে হযরত আসওয়াদ (রাযিঃ)এর লাশও ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে দেখে কিছুক্ষণের জন্য মুখ ঘুরিয়ে নিলেন। সাহাবায়ে কেরাম এর কারণ জিজ্ঞাসা করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরশাদ করলেন ঃ এখন সে জান্নাতের দু'জন হুরের সঙ্গে অবস্থান করছে। আল্লাহ পাক তাঁর চেহারা সুন্দর করে দিয়েছেন। তাঁর দেহ সুগন্ধে ভরে দিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম তাঁর আলোচনা করে বলতেন ঃ তিনি এমন এক জান্নাতী ব্যক্তি যিনি আল্লাহর জন্য একটি নামাযও পড়েননি। অথচ তিনি সোজা জান্নাতে চলে গেছেন।

শহীদগণের মাযার জিয়ারতের পর আমরা পুনরায় সফর আরম্ভ করি, কিছুক্ষণ পর তাবুক ও সিরিয়াগামী কেন্দ্রীয় সড়কে গিয়ে পৌঁছি। খাইবার পর্যন্ত সড়কের উভয় দিকে পাহাড় ও টিলার সারি দেখা যাচ্ছিল। কিন্তু এখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হলে উভয় দিকে ধু ধু মরুপ্রান্তর। সেখানে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত কোন বসতি, টিলা, বৃক্ষ, ঝোপঝাড়, সবুজ ভূমি, পানি কিছুই নেই। বৃক্ষলতাশূন্য মরুপ্রান্তর, যাতে দূর দূরান্ত পর্যন্ত জীবনের কোন লক্ষণ চোখে পড়ে না। এরূপ মরুভূমি খাইবার থেকে তাবুক পর্যন্ত চলে গেছে। বরং তা আরও সম্মুখে জর্দান সীমান্তের কয়েক কিলোমিটার ভিতর পর্যন্ত চলে গেছে। এই মরুভূমির দৈর্ঘ্য প্রায় ৮/৯ শত কিলোমিটার হবে। তাকে 'আন্‌নুফদ' মরুভূমি বলে। ইতিপূর্বে আমি কখনো এত দীর্ঘ মরুভূমি গাড়ীযোগে অতিক্রম করিনি।

ভাবছিলাম আমরা শীতের মনোরম ঋতুতে সফর করছি। সফরের জন্য নতুন আরামপ্রদ ও শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত প্রাইভেট কার রয়েছে। আলহামদুলিল্লাহ! পর্যাপ্ত পরিমাণ পথসম্বল রয়েছে। উন্নতমানের পাকা সড়কপথ। মৌলবী আতাউর রহমান সাহেব ঘন্টা প্রতি ১২০ থেকে ১৫০ মিলোমিটার গতিতে গাড়ী চালাচ্ছেন। তার পরও কোনরূপ ধাক্কা অনুভব হচ্ছে না। ইনশাআল্লাহ আমরা সন্ধ্যা নাগাদ তাবুকে পৌঁছে যাব, এই আত্মতৃপ্তিও আছে। কিন্তু বৃক্ষলতাশূন্য প্রাণ ওষ্ঠাগত হওয়ার মত এই মরুপ্রান্তরে এবং এর কেয়ামতসম উত্তাপ, যেখানে আকাশ অগ্নিবর্ষণ করছে, ভূমি অগ্নিশিখা উদগীরণ করছে, যখন সড়ক ছিল না, গাড়ী ছিল না, গরম থেকে বাঁচার কোন ব্যবস্থাও ছিল না—এমন গরমের মধ্যে উভয় জাহানের সর্দার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর প্রতি প্রাণউৎসর্গকারী সাহাবাগণ তাবুক যুদ্ধের সময় একাধারে দু' সপ্তাহের অধিক সময় ধরে উট এবং ঘোড়ায় আরোহণ করে ভয়ঙ্কর এই মরুপ্রান্তর অতিক্রম করেন। যেখানে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত গাছপালার একটি পাতাও দৃষ্টিগোচর হয় না। হযরত আবু যর গিফারী (রাযিঃ) তো এই যুদ্ধে অংশগ্রহণের সৌভাগ্য অর্জনের জন্য সৈন্যবাহিনী রওনা হয়ে যাওয়ার পর একাই পদব্রজে যাত্রা করেছিলেন।

আল্লাহু আকবার! তাঁদের দৃঢ় সংকল্প, দুর্দান্ত সাহস এবং

আত্মোৎসর্গের কল্পনা করতেও আজ আমাদেরকে ঘর্মাক্ত হতে হয়। আল্লাহ তাঁদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট।

এই মহাসড়ক ধরে কিছুদূর চলার পর ডানদিকে একটি মোড় আসে। এখান থেকে মাদায়েনে সালেহের দিকে একটি সড়পথ বের হয়ে গেছে। মাদায়েনে সালেহ এখান থেকে মাত্র কয়েক মাইল দূরে অবস্থিত। এটি হযরত সালেহ (আঃ)এর বসতি ছিল। সেখানে কওমে সামুদ তাদের বিস্ময়কর নির্মাণকার্য সহ বাস করত। কিন্তু পরে হযরত সালেহ (আঃ)কে মিথ্যারোপ করা এবং অবিরত আল্লাহর নাফরমানী করার ফলে তাদের উপর ভয়ংকর শাস্তি নাযিল হয়। তাদের সেই বসতির প্রাচীন নিদর্শনাবলী সেখানে এখনও দেখা যায়। আমাদের সঙ্গীদের মধ্যে কারী বশির আহমাদ সাহেব এবং আতাউর রহমান সাহেব পূর্বে তা দেখেছেন। তারা বলেন ঃ পাহাড়ে নির্মিত তাদের সেসব গৃহের নিদর্শন এখনো পাওয়া যায়। একবার মনে হল, এ জনপদ দেখে যাওয়া দরকার। কিন্তু আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হওয়ার স্থলকে উদ্দেশ্য বানিয়ে সেখানে যাওয়ার সাহস হল না। হাদীসে পড়েছিলাম, তাবুক যাওয়ার পথে এই জনপদের নিকট দিয়ে অতিক্রম করার সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কাপড় দ্বারা তাঁর মুখমণ্ডল ঢেকে নেন। উট জোরে হাঁকান এবং সাহাবায়ে কেরামকে এখানকার কোন গৃহে প্রবেশ না করার জন্য, এখানকার পানি পান না করার জন্য এবং তা দ্বারা উযু না করার জন্য তাকীদ করেন। যে সকল সাহাবী ভুলে বা অজ্ঞতাবশতঃ পানি নিয়েছিলেন, অথবা আটার খামীরা তৈরী করেছিলেন, তাদেরকে পানি ফেলে দেওয়ার ও আটা উটকে খাওয়ানোর জন্য এবং সেখান দিয়ে অবনত মস্তকে অতিক্রম করার নির্দেশ দেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ কর্মপন্থায় জানা যায় যে, যেসব স্থানে আল্লাহর আযাব অবতীর্ণ হয়েছে সেখান দিয়ে অতিক্রমকালে এস্তেগফার পড়তে পড়তে যাওয়া দরকার।

আল্লাহ ভাল জানেন—এসব স্থানে কেমন সব আত্মিক বিষক্রিয়া রয়েছে। যেগুলো থেকে বাঁচানোর জন্য হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এরূপ পন্থা অবলম্বনের তাকীদ করেছিলেন।

তাইমা নগরীতে

যাই হোক! আমরা সেই অভিশপ্ত জনপদের দিকে মোড় না নিয়ে তাবুকগামী মহাসড়কে সফর অব্যাহত রাখি। প্রায় দুইটা বা আড়াইটা পর্যন্ত অবিরত চলার পর আমরা তাইমা শহরের দেখা পাই। আমরা এখানে বিরতি দিয়ে জোহরের নামায আদায় করি। তারপর একটি তুর্কি রেস্তোরায় দুপুরের খাবার খাই।

তাইমা একটি প্রাচীন শহর। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র যুগ থেকে এর এ নামই চলে আসছে। এখানেও বিরাট সংখ্যক ইহুদীর বাস ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবার এবং 'ওয়াদিয়ুল কুরা' জয় করেন, তখন এখানকার অধিবাসীরা যেচে এসে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে কর প্রদানে সম্মতি জানায়। এভাবে এ অঞ্চলও সন্ধি সূত্রে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শাসনাধীনে এসে যায়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত ইয়াযীদ বিন আবু সুফিয়ান (রাযিঃ)কে এখানকার গভর্নর নিযুক্ত করেন। আরবের প্রসিদ্ধ বনী তাঈ গোত্র (প্রসিদ্ধ হাতেম তাঈ এ গোত্রের লোক) তাইমার অদূরে বাস করত। প্রসিদ্ধ ইহুদী সরদার সমুয়াল বিন আদিয়ার দূর্গ এখানেই ছিল। যে সামুয়ালের কাব্যগাঁথা 'দেওয়ানে হামাছা' গ্রন্থে স্থান পেয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম খাইবার জয় করার পর সেখানকার ইহুদীরা খাইবারের জমি তাদেরকে বন্টন করে দেওয়ার জন্য আবেদন করে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদের দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। সুতরাং সেখানকার জমিগুলো ইহুদীরাই চাষ করতে থাকে। এর আমদানীর অর্ধেক মুসলমানরা পেত। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর খেলাফতকালে এবং হযরত উমর (রাযিঃ)এর খেলাফতের প্রথম দিকেও খাইবারের ইহুদীদের সাথে এই কারবার পূর্ববৎ চালু থাকে, কিন্তু তাদের স্বভাবজাত কুকর্ম বারবার মাথাচাড়া দিয়ে উঠতে থাকে। এমনকি একবার হযরত আবদুল্লাহ বিন উমর (রাযিঃ) যখন তাঁর জমি দেখাশোনার জন্য খাইবার যান। তখন এখানকার ইহুদীরা রাতের অন্ধকারে তাঁর উপর

আক্রমণ করে। ফলে তাঁর পায়ের হাড্ডি ভেঙ্গে যায়। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) সাহাবায়ে কেরামের পরামর্শক্রমে ইহুদীদের সঙ্গে বর্গাচাষের এই কারবার বন্ধ করে দেন এবং তাদেরকে খাইবার থেকে বহিস্কার করেন। তখন তারা তাইমায় এসে বসতি স্থাপন করে। তাইমায় অনেক শীত। খাবার শেষ করতে করতে আসরের সময় নিকটবর্তী হয়ে যায়। এখানকার একটি মসজিদে আসর নামায আদায় করি। উযু করলাম। পানি এত হিমশীতল যে, হাত পা যেন অবশ হয়ে যাচ্ছিল।

আসর নামাযান্তে পুনরায় সফর শুরু হলো। সম্মুখে আবার সেই দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত মরুভূমি। এখন মৌলবী আমীন আশরাফ (সাল্লামাহু) গাড়ী চালাচ্ছিলেন। সে যে কোনভাবে মাগরিব নাগাদ তাবুক পৌছার চেষ্টা করছিল। পরিচ্ছন্ন সড়ক পথ। দ্রুত গাড়ী চালাতে কোন সমস্যা হচ্ছিল না। তাই একদিকে সূর্য অস্ত যাচ্ছিল, অপরদিকে তাবুক শহরের দৃশ্যও স্পষ্ট হতে চলছিল। আল্লাহর মেহেরবানী মাগরিব নামায আমরা তাবুকে গিয়েই আদায় করি।

তাবুকে এক রজনী

মাগরিবের সময় আমরা তাবুকে পৌছি। রাত আমাদের এখানেই কাটাতে হবে। আমাদের সফরসঙ্গী জনাব কারী বশীর আহমদ সাহেব এখানকার প্রধান মার্কেটের পরিচ্ছন্ন একটি হোটেলে পূর্বেই থাকার ব্যবস্থা করে রেখেছিলেন। সারাদিনের ভ্রমণে ক্লান্তি চরমে পৌছেছিল। হোটেলে আরামদায়ক কক্ষে পৌছে তাই বড় শান্তি লাগছিল। কিন্তু ভাবছিলাম, এত আরামে উন্নতমানের প্রাইভেট কারে মাত্র একদিনের সফরে আমরা এত পরিশ্রান্ত হয়ে পড়েছি, কিন্তু ইহ–পরকালের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সঙ্গীগণ এই বিশাল মরুভূমি প্রচণ্ড গরমের মৌসুমে উটে আরোহণ করে অতিক্রম করেছিলেন। (কবিতা) ঃ

چه نسبت خاك را با عالم پاك

"স্বর্গের সঙ্গে মর্তের মাটির কি তুলনা হয়?"

মদীনার তুলনায় এখানে শীত অনেক বেশী। এশার সময় উষ্ণ পানি দ্বারা উযূ করে আমরা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের তাবুর জায়গায় নির্মিত পবিত্র মসজিদ অভিমুখে রওনা করি। হোটেল থেকে মসজিদটি একটু দূরে। তাই গাড়ীতে যেতে হল। আলহামদুলিল্লাহ! আমরা সেই মসজিদে এশার নামায আদায় করলাম। এখন তো মসজিদ অনেক বড়, প্রশস্ত ও জাঁকজমকপূর্ণ। মসজিদের হলে ছাদের মাঝ বরাবর একটি চার কোণা দাগ দেয়া আছে। যা তাবুক অবস্থানকালে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র তাবুর স্থান নির্দেশ করে।

বর্তমানে তো তাবুক আধুনিক ধাঁচের একটি শহর। শহরটি ছোট হলেও খুব সুন্দর, জাঁকজমকপূর্ণ এবং আধুনিক নগরায়নিক সুবিধাদিতে সুসজ্জিত। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে এটি ছোট একটি বসতি ছিল। এখানকার একটি ঝর্ণাকে তাবুক বলা হত। ঝর্ণার নামেই বসতির নাম তাবুক প্রসিদ্ধ হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সকল সফরের মধ্যে তাবুক যুদ্ধের সফরটি সম্ভবতঃ সর্বাধিক কষ্টের সফর ছিল। সেই সফরের কারণ এই ছিল যে, নবম হিজরী সনে আরবের খৃষ্টানরা রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস বরাবর এই মর্মে একটি পত্র লিখে পাঠায়—

"হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকাল হয়েছে। (মাআযাল্লাহ) এখানকার লোকেরা দুর্ভিক্ষের কবলে পতিত, তারা অনাহারে মৃত্যুবরণ করছে। তাই আরবের উপর আক্রমণের জন্য এর চেয়ে ভাল সুযোগ আর হতে পারে না।"

এ সংবাদ শ্রবণ করে সঙ্গে সঙ্গে হেরাক্লিয়াস যুদ্ধ প্রস্তুতির নির্দেশ দেয়। চল্লিশ হাজার সৈন্যের নির্ভীক এক সৈন্যবাহিনী প্রস্তুতি গ্রহণ করে।

অপরদিকে সিরিয়ার কিছু নিবতী সওদাগর যায়তুন বিক্রি করার জন্য মদীনায় আসত। তারা মুসলমানদেরকে জানায় যে, আপনাদের উপর আক্রমন করার জন্য হেরাক্লিয়াস বিরাট এক সৈন্যবাহিনী তৈরী করেছে, যার অগ্রগামী দল বলকা পর্যন্ত পৌঁছে গেছে। হেরাক্লিয়াস তার সৈন্যবাহিনীকে পুরো বৎসরের বেতনও দিয়ে দিয়েছে।

এ সংবাদে পেয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে

অগ্রগামী হয়ে তাবুক যাওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন এবং সাহাবায়ে কেরামকে প্রস্তুত হওয়ার নির্দেশ দেন।

সময়টি ছিল সাহাবায়ে কেরামের জন্য কঠিন পরীক্ষার সময়। তৎকালের মহাপরাশক্তি রোমের সঙ্গে মোকাবেলা, আরব মরুভূমির গ্রীষ্মের এমন যৌবনকাল, যখন আকাশ অগ্নিশিখা বর্ষণ করছে আর জমিন অগ্নি উদগীরন করছে, ভয়ঙ্কর মরুর মধ্যে প্রায় আটশ' কিলোমিটারের দূরত্ব। বাহনের স্বল্পতা, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, পবিত্র মদীনায় খেজুর পাকার মওসুম, অর্থাৎ সারা বছরের অক্লান্ত পরিশ্রমের ফলাফল যেন এ সময় খেজুরের আকৃতিতে হাতে আসছিল। যার উপর সারাবছরের জীবিকা নির্বাহ নির্ভর করছে, এমতাবস্থায় মদীনা থেকে সফর করা অধিক অর্থনৈতিক জটিলতাকে নিমন্ত্রণ দেওয়ার নামান্তর।

কিন্তু এটা উভয় জগতের সরদার এবং তাঁর প্রতি প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবায়ে কেরামেরই সৎসাহস ছিল যে, তাঁরা সকল সমস্যাকে ডিঙিয়ে পরীক্ষা সংকুল এই সফরের জন্য বের হয়ে পড়েন। এই সফরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের অনেক মোজেযা প্রকাশ পায়। অবশেষে তিনি তাবুকের এই স্থানে অবস্থান করেন, বর্তমানে যেখানে এই মসজিদ নির্মাণ করা হয়েছে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাবুকে ২০ দিন অবস্থান করেন। কিন্তু হিরাক্লিয়াসের পক্ষ থেকে কেউ মোকাবেলা করতে আসেনি। বাহ্যতঃ এখানে যুদ্ধ হয়নি ঠিক, তবে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই পরিমাণ ত্যাগ স্বীকার করে এখানে আগমন করায় ইসলামের বিজয় ধারায় এক নতুন অধ্যায় সূচিত হয়। শত্রুদের উপর মুসলমানদের প্রভাব বিস্তার লাভ করে। আশেপাশের গোত্রের লোকেরা নিজেরা এগিয়ে এসে অধীনস্থতা স্বীকার করে। সিরিয়ারই বিভিন্ন অঞ্চল 'জরবা', 'ইযরাহ' এবং 'আইলার' শাসকগণ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে উপস্থিত হয়ে সন্ধি করে এবং কর আদায় করতে সম্মত হয়। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাদেরকে সন্ধিপত্র লিখে দেন।

এখান থেকেই হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ

বিন ওলীদ (রাযিঃ)কে চারশত অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে 'দাওমাতুল জান্দাল' প্রেরণ করেন। দাওমাতুল জান্দালও হেরাক্লিয়াসের শাসনাধীন ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত খালিদ (রাযিঃ)কে পাঠানোর সময় তাঁকে বলেছিলেন ঃ

"তুমি দাওমাতুল জান্দালে পৌঁছে সেখানকার শাসক উকাইদিরকে শিকারে রত দেখতে পাবে। তোমরা তাকে হত্যা না করে বন্দী করে আমার নিকট নিয়ে আসবে।"

সুতরাং হযরত খালিদ (রাযিঃ) যখন দাওমাতুল জান্দালের দুর্গসমূহের নিকট পৌঁছেন, তখন উকাইদির গ্রীষ্মকালের জোসনা রাতে দুর্গ প্রাচীরে সস্ত্রীক বসে গান শুনছিল। হঠাৎ সে একটি নীল গাভীকে দুর্গ ফটকের সাথে টক্কর মারতে দেখল। উকাইদির অনতিবিলম্বে তার ভ্রাতা ও অন্যান্যদেরকে সঙ্গে করে গাভী শিকার করতে দুর্গ থেকে বের হয় এবং অশ্বারোহণ করে তার পিছে পিছে দৌড়াতে থাকে। ইতিমধ্যে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাযিঃ) সেখানে এসে পৌঁছেন। উকাইদিরের ভাই হাসসান নিহত হয়। হযরত খালিদ (রাযিঃ) উকাইদিরকে গ্রেফতার করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট নিয়ে আসেন। উকাইদির হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে দুই হাজার উট, ৮০০ ঘোড়া, চারশ' বর্ম এবং চারশ' বর্শা প্রদানের চুক্তিতে সন্ধি করে এবং কর প্রদান করে ইসলামী রিয়াসতের অধীনস্ত হয়ে যায়।

তাবুকের এই মসজিদ যাকে সেখানে মসজিদুন্নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলা হয়—পৌঁছার পর তাবুক যুদ্ধের এ সব ঘটনা চিন্তার জগতকে আচ্ছন্ন করে রাখে। এ সকল কল্পনায় মনজগতে অপূর্ব এক ভাবাবেগ ও পুলক অনুভব হতে থাকে।

اللهم صل على سيدنا و مولانا محمدن النبى الأمى و على اله واصحابه و بارك و سلم –

অর্থ ঃ "হে আল্লাহ! আমাদের সরদার, আমাদের প্রিয় মনিব, উম্মী নবী মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, তাঁর আল এবং তাঁর আসহাবের উপর রহমত, বরকত এবং সালাম অবতীর্ণ কর।"

এশার নামাযান্তে পাকিস্তানী একটি রেস্তোরায় আহার করি। তাবুক থেকে সামান্য দূরে সৌদী সেনা ক্যাম্প। বিরাট সংখ্যক পাকিস্তানী সৈন্যও দীর্ঘদিন ধরে সেখানে অবস্থান করছে। যে কারণে তাবুকে পাকিস্তানীদের আনাগোনাও যথেষ্ট পরিমাণ। তাই এখানে পাকিস্তানী রেষ্টুরেন্টও অনেক। এই রেষ্টুরেন্টের মালিকও পাকিস্তানী। তিনি আমাদের সফরসঙ্গী কারী বশীর আহমাদ সাহেবের বন্ধুলোক। রাতের খাবারের ব্যবস্থা তাঁর পক্ষ থেকেই ছিল। তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে খাঁটি পাকিস্তানী খাবারের ব্যবস্থা করেন। সারাদিনের ক্লান্তির পর খুব আগ্রহ সহকারে তা আহার করি।

আহার শেষে সামান্য সময় হাঁটাচলা করে খুব তাড়াতাড়ি আমরা ঘুমিয়ে যাই।

পরদিন প্রত্যুষে (২রা জানুয়ারী ১৯৮৬) ফজর নামায পড়েই আমরা সংক্ষিপ্ত নাস্তা সেরে সম্মুখের সফরে যাত্রা করি। এখান থেকে জর্দান সীমান্ত প্রায় ১০০ কিলোমিটার। মৌলবী আতাউর রহমান সাহেব নতুন উদ্যমে গাড়ী হাঁকিয়ে দ্রুত এই দূরত্ব অতিক্রম করেন। সৌদী আরবের সীমান্তবর্তী অঞ্চল 'হালায়ে আম্মার' এদিকেই অবস্থিত। সেখানে কাষ্টম, ইমিগ্রেশন প্রভৃতির চৌকি রয়েছে। ভোরবেলায় এখানে তেমন ভীড় ছিল না। তাই এসব ঘাঁটি তাড়াতাড়ি পার হয়ে যাই। পুনরায় গাড়ীতে আরোহণ করলে কয়েক মুহূর্তের মধ্যে আমরা সৌদী আরব থেকে বের হয়ে জর্দানের অঞ্চলে প্রবেশ করি। জর্দানের সীমান্ত চৌকি মুদাওয়ারাতে পুনরায় কাষ্টম, ইমিগ্রেশন ইত্যাদির কাজ সম্পন্ন করতে হল। এখানে কিছুটা দেরীও হল। এখান থেকে আমরা যখন রওনা করি তখন বেলা দশটা বেজে গেছে।

মাত্র কয়েক গজ দূরত্ব অতিক্রম করতেই এক নতুন জগত দেখতে পেলাম। মানুষের পোশাক–পরিচ্ছদ, বাচনভঙ্গি, সড়ক ও ভবনের ধরন, মোট কথা সব কিছুতে পার্থক্য সুস্পষ্ট। মদীনা মুনাওয়ারা থেকে হালায়ে আম্মার পর্যন্ত সড়ক যদিও প্রশস্ত ছিল না তবুও অত্যন্ত মসৃণ ও উন্নতমানের ছিল। সেখানে গাড়ী যেন সাঁতরিয়ে চলে। কিন্তু জর্দানে প্রবেশ করার পর সড়কের অবস্থা ছিল জীর্ণ–শীর্ণ। ফলে চলার গতি মন্থর

হয়ে যায়। সফর অপেক্ষাকৃত কষ্টকরও হয়। স্থানে স্থানে সড়ক মেরামতের কাজ চলছে। যে কারণে বারবার আধাপাকা রাস্তায় নামতে হচ্ছিল। সীমান্ত থেকে আম্মান প্রায় দুইশ' কিলোমিটার দূরে। এ সম্পূর্ণ পথ শুষ্ক মরুভূমি এবং পাথরে পরিপূর্ণ। কিছুদূর যাওয়ার পর এমন সব পাহাড় দেখতে পেলাম, যেগুলো থেকে 'ফসফরাস' বা সাদা পাথর বের হচ্ছে। কিন্তু এই পথে বৃক্ষলতার নাম–গন্ধও দেখা গেল না। প্রায় তিন ঘন্টা এই সড়কে সফর অব্যাহত থাকে। পথিমধ্যে ছোট ছোট বসতি এবং শহর অতিক্রম করতে থাকে। পরিশেষে প্রায় একটার সময় জর্দানের রাজধানী আম্মানের নিদর্শন দৃষ্টিগোচর হয়।

আম্মানে

আম্মানে প্রবেশ করলাম। পথঘাট অচেনা। পথচারীদেরকে জিজ্ঞাসা করে করে একটি হোটেলে পৌঁছি। সেখানেই অবস্থান করি। শীতের ছোট দিন। যোহর নামায আদায় করে দুপুরের খাবার শেষ করতেই আছরের সময় হয়ে গেল। আছর নামাযের পর এখানকার এক প্রসিদ্ধ কুতুবখানা 'দারুল বাশীর' যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। সেখান থেকে কয়েকজন বন্ধুর ঠিকানা জেনে নেওয়ারও দরকার ছিল। হোটেল থেকে বের হয়ে জিজ্ঞাসা করে করে 'দারুল বাশীরে' পৌঁছে যাই। কুতুবখানাটি আম্মানের জাঁকজমকপূর্ণ এক অঞ্চল 'আব্দালী'তে অবস্থিত। এটি আরবী গ্রন্থসমূহ প্রকাশের এবং বিক্রির বিরাট বড় কেন্দ্র। এখান থেকে সিরিয়ার একজন আলেম শায়েখ ওয়াহাবী সোলাইমানের ঠিকানাও জানতে পারলাম। কুতুবখানার একজন লোক পথ দেখানোর জন্য সঙ্গী হলেন। তিনি আমাদেরকে শায়েখ ওয়াহাবী সুলায়মানের নিকট পৌঁছে দেন। প্রায় আধ ঘন্টা তাঁর সাথে কথাবার্তা হলো। কোন কোন বিষয়ে মত বিনিময় হল।

সেখান থেকে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। সে সময় জর্দানে এহসান রশিদ সাহেব পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ছিলেন। করাচী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলরও ছিলেন তিনি। আছরের সময় ফোনে তাঁর সঙ্গে কথা হয়েছিল। তাঁর আগ্রহে রাতের খাবার তাঁর ওখানে খাওয়ার সিদ্ধান্ত হয়। সাড়ে সাতটার সময় তিনি গাড়ী পাঠিয়ে দেন। আটটার কাছাকাছি আমরা

তাঁর বাড়ী পৌঁছি। আহারান্তে অনেক রাত পর্যন্ত তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা হয়। জর্দানের অনেক বিষয়ে অবগত হই। রাত এগারোটার দিকে আমরা হোটেলে ফিরে আসি।

পরদিন ছিল জুমাবার। সেদিন আম্মান এবং তার শহরতলীর বিশেষ বিশেষ স্থান ঘুরে দেখার ইচ্ছা ছিল। পাকিস্তানের রাষ্ট্রদূত ডাঃ ইহসান রশীদ সাহেবকে আল্লাহতাআলা উত্তম পুরস্কার প্রদান করুন। তিনি তার প্রাইভেট সেক্রেটারী মালিক আফজাল সাহেবকে পথপ্রদর্শনের জন্য আমাদের সঙ্গে দেন। ভোরবেলা তিনি আমাদের নিকট চলে আসেন।

রোমান ষ্টেডিয়াম

হোটেল থেকে নামতেই আমার ভাগ্নে মৌলবী আমীন আশরাফ (সাল্লামাহু) হোটেলের একদম সামনেই প্রাচীন এক ষ্টেডিয়ামের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করল। কাছে গিয়ে দেখে অনুমান হল যে, এটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগেরও পূর্বের পুরাতন একটি ভবনের ভগ্নাবশেষ। ভবনটি ঠিক আধুনিক কালের ষ্টেডিয়ামের ধাচে তৈরী। মালিক আফজাল সাহেব বললেন ঃ এটি রোমানদের যুগের নির্মিত ষ্টেডিয়াম। সে যুগের প্রসিদ্ধ অলিম্পিক খেলার জন্য এটি ব্যবহৃত হত। ষ্টেডিয়াম তৈরীর সূচনাও সে যুগেই শুরু হয়। ষ্টেডিয়াম মূলতঃ একটি গ্রীক শব্দের ল্যাটিন সংযোজন। ল্যাটিন ভাষায় ষ্টেড (Stade) প্রায় ৬০৬ ফিটের সমান দূরত্বের এক পরিমাপকে বলা হয়। সে যুগের দৌড় প্রতিযোগিতায় এটিকে দূরত্বের মাপকাঠি মনে করা হত। আর দৌড়ের জন্য যে মাঠ তৈয়ার হত, তা এক ষ্টেড পরিমানের দূরত্বের হত ; তাই তার নাম ষ্টেডিয়াম রাখা হয়। প্রথমে এই নাম শুধুমাত্র দৌড়ের মাঠের জন্য ব্যবহৃত হত। কিন্তু সে যুগে অন্যান্য ক্রীড়া প্রতিযোগিতার প্রচলনও ছিল। তাই পরবর্তীকালে এর অর্থে ব্যাপকতা এনে সর্বপ্রকার খেলার মাঠকে ষ্টেডিয়াম বলা হতে থাকে। সাথে সাথে দর্শকদের সুবিধার্থে সিঁড়ির মত নিচু আসনও নির্মাণ শুরু হয়।

আমাদের সম্মুখের ষ্টেডিয়ামটিও সেই ধাঁচেরই একটি ষ্টেডিয়াম, তাতে বসার সেই আসনগুলো এখনও বিদ্যমান রয়েছে। রাজবংশের

লোকদের বসার জন্য পৃথক ব্যবস্থাও রয়েছে। বর্তমানে ভবনটি যদিও বিরান অবস্থায় পড়ে আছে এবং প্রত্নতত্ত্ব দপ্তর কেবলমাত্র পর্যটকদের মনোরঞ্জনের জন্য তা সংরক্ষণ করছে। কিন্তু বিরান ভবনের এই ভগ্নাবশেষও রোমান যুগের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের উপাখ্যান শুনিয়ে থাকে। যার দিব্যদৃষ্টি আছে, সে এর প্রতিটি ইটের গায়ে 'ধরা পৃষ্ঠের সবই ধ্বংসশীল' এর অনস্বীকার্য বাস্তবতা উৎকীর্ণ দেখতে পায়। দোর্দণ্ড প্রতাপের কত প্রতিমা কত দিন যে এখানে প্রতাপের দণ্ড চালিয়েছে, কে তার হিসাব রেখেছে? কিন্তু তাদের সেই আনন্দ আহলাদের মুহূর্তগুলো কত সংক্ষিপ্ত ছিল। পক্ষান্তরে তাদের ধ্বংস ও অস্তিত্বহীনতার সময়কাল যা আজও অব্যাহত আছে তা কত দীর্ঘ। ভবিষ্যতেও এর অন্ত নেই। (কবিতা) ঃ

بس نامور کہ زیر زمیں دفن کردہ اند

خاکش چناں بخورد کمزواستخواں نماند

خیرے کن اے فلاں غنیمت شمار عمر

زاں پیشترگہ بانك برآید فلاں نماند

"কত প্রখ্যাত ব্যক্তিত্ব ভূতলে সমাহিত হলো
তাদেরকে মাটি এমনভাবে খেয়ে ফেলেছে যে,
তাদের অস্থিমজ্জাও আর অবশিষ্ট নেই।
হে ব্যক্তি! জীবনকে মূল্য দাও,
সেদিন আসার পূর্বেই কিছু পুণ্য সংগ্রহ কর,
যেদিন ঘোষিত হবে যে, অমুক আর নেই।"

মালিক আফজাল সাহেবের পথনির্দেশে আমরা এখান থেকে সম্মুখে অগ্রসর হই। আম্মান এবং এর আশ-পাশের এলাকা কোন কোন নবী এবং সাহাবীর বাসস্থান ছিল এবং এ সকল এলাকায় তাঁদের মাযারও রয়েছে। এছাড়াও আরো অনেক ঐতিহাসিক স্থান এখানে রয়েছে। আমাদের অন্তরে সেগুলো দেখার বাসনা ছিল।

আমাদের গাড়ী আম্মানের বিভিন্ন সুন্দর সড়কপথ অতিক্রম করছিল। আম্মান জর্দানের রাজধানী। শহরটি এক ডজনেরও অধিক পাহাড়ের

উপর এবং তার পাদদেশে অবস্থিত। এর মধ্যে ৭টি পাহাড় বড় এবং উল্লেখযোগ্য। যা শহরটিকে সাতটি বড় বড় মহল্লায় বিভক্ত করেছে। শহরটি পাহাড়ের উপর এবং তার পাদদেশে অবস্থিত হওয়ায় খুব বেশী উচু নীচু এবং তাতে এক বিরল সৌন্দর্য সৃষ্টি হয়েছে। শহরটির আরেকটি বৈশিষ্ট্য এই যে, এর প্রায় প্রতিটি ভবন একই রঙের পাথরের তৈরী। হালকা সুরমা রঙ্গের পাথর, যা জর্দানেই পাওয়া যায়। এখানকার অধিকাংশ নির্মাণ কাজেই এই পাথর ব্যবহৃত হয়। এতে করে শহরের ভবনগুলোতে মনোরম এক রঙ্গাভাব পরিলক্ষিত হয়।

আম্মান শত সহস্র বছরের প্রাচীন একটি নগরী। এর ইতিহাস হযরত লূত (আঃ)এর যুগ পর্যন্ত পৌছে। তখন থেকে এ শহরের এই নামই চলে আসছে। যে অঞ্চলে আম্মান অবস্থিত তাকে বালকা বলা হত। এটি রোম সাম্রাজ্যের একটি ডিভিশনের মত ছিল, এর প্রধান কার্যালয় ছিল আম্মানে। যে কারণে একে আম্মানুল বালকাও বলা হত। হাদীস শরীফে এই শহরের এই নামই এসেছে। কিতাবে পড়েছিলাম, আম্মান অত্যন্ত সবুজ শ্যামল একটি শহর। কিন্তু বর্তমানে শহরটিকে খুব বেশী সবুজ শ্যামল পেলাম না। তবে তার শহরতলী বেশ উর্বর সবুজ ভূমি।

হযরত ইউশা (আঃ)এর মাযারে

আম্মান শহর থেকে বের হওয়ার পর সর্বপ্রথম অত্যন্ত সুদৃশ্য একটি উপত্যকা অতিক্রম করে আমরা একটি পাহাড়ের চূড়ায় আরোহণ করি। চূড়াটি এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ চূড়া মনে হচ্ছিল। এর উপর থেকে অনেক দূর পর্যন্ত বিস্তৃত সবুজে ঢাকা উপত্যকাসমূহ বড় মনোরম লাগছিল। পাহাড়ের এক ধারে একটি মসজিদ রয়েছে। মালিক আফজাল সাহেব বললেন ঃ এই মসজিদেরই এক কক্ষে হযরত ইউশা (আঃ)এর মাযার রয়েছে। আমরা মসজিদে প্রবেশ করে অত্যন্ত দীর্ঘ একটি কবর দেখতে পাই। এর দৈর্ঘ্য বার থেকে পনের গজের মতো হবে। এ কবরটি হযরত ইউশা (আঃ)এর মাযার বলে প্রসিদ্ধ।

হযরত ইউশা (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)এর খাস খাদেম ছিলেন। তার নাম যদিও পবিত্র কুরআনে উল্লেখ নেই, কিন্তু নাম না নিয়ে তাঁর

অনেক ঘটনা পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করা হয়েছে। উদাহরণস্বরূপ ঃ হযরত মূসা (আঃ) যখন বনী ইসরাঈলকে আমালেকার সঙ্গে জিহাদ করার জন্য উদ্বুদ্ধ করতে চাইলেন এবং সে সম্প্রদায়ের সকলে চরম অবাধ্যতার সাথে হযরত মূসা (আঃ)এর জিহাদের দাওয়াতকে প্রত্যাখ্যান করল, তখন হযরত ইউশা (আঃ) প্রথম ব্যক্তি ছিলেন যিনি বনী ইসরাঈলকে সাহস যোগানোর চেষ্টা চালান।

এমনিভাবে সূরা কাহাফে হযরত মূসা (আঃ) এবং খিযির (আঃ)এর যে ঘটনা বর্ণিত হয়েছে, সেখানে যেই যুবক হযরত মূসা (আঃ)এর সঙ্গে ছিলেন—একটি সহীহ হাদীসের বর্ণনানুপাতে সেই তরুণ যুবক ছিলেন হযরত ইউশা (আঃ)। হযরত মূসা (আঃ) এর মৃত্যুর পর তাঁকে নবুয়াত দান করা হয় এবং তাঁকেই বনী ইসরাঈলের নেতৃত্ব দান করা হয়। ফিলিস্তিনের আমালেকার সঙ্গে জিহাদের যে অভিযান হযরত মূসা (আঃ)এর জীবদ্দশায় অসম্পূর্ণ রয়ে যায়, হযরত ইউশা (আঃ)এর হাতেই তা সম্পূর্ণ হয়। তিনি বনী ইসরাঈলকে সঙ্গে নিয়ে ফিলিস্তিনে অধিষ্ঠিত অত্যাচারী ও স্বেচ্ছাচারী আমালেকা সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে জিহাদ করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁকে বিজয় দান করেন। তিনি এই পবিত্র ভূখণ্ড সম্পূর্ণটাই দখল করেন। পবিত্র কুরআনে এ ঘটনারও উল্লেখ রয়েছে।

বর্তমানে এ বিষয়ে ১০০ ভাগ নিশ্চিত হওয়া তো প্রায় অসম্ভব যে, এ কবরটি প্রকৃতই হযরত ইউশা (আঃ)এর কবর! তবে এ সম্পূর্ণ অঞ্চল হযরত ইউশা (আঃ)এর বিজিত অঞ্চলেরই অংশ। তাই এ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে প্রচলিত একথাটি বাস্তব হওয়া অসম্ভব কিছু নয়। কবরের অস্বাভাবিক দৈর্ঘ্য আমাদের জন্য বিস্ময়কর ব্যাপার ছিল। কিন্তু পরবর্তীতে জর্দান ও সিরিয়ায় অন্যান্য যে সকল নবীর মাযার দেখতে পাই, সেখানেও এই একই অবস্থা দৃষ্টিগোচর হয়। এরূপ মনে হয় যে, সে যুগে মহান কোন ব্যক্তিত্বের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য তার কবর খুব লম্বা বানানো হত। আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

যাই হোক, আমাদের মহান এক নবীর মাযার যিয়ারত করার ও তাঁকে সালাম পেশ করার সৌভাগ্য নসীব হয়। দোজাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র রওজার পর অন্য

কোন নবীর মাযারে উপস্থিত হওয়া অধমের জন্য এটিই প্রথম ছিল।

মসজিদ থেকে যখন বের হই, তখন শীত প্রচণ্ড রূপ ধারণ করেছে, যা অসহনীয় মনে হচ্ছিল। প্রচণ্ড তুষার বায়ু প্রবাহিত হচ্ছিল। এখানকার তাপমাত্রা হিমাংকের পর্যায়ে পৌঁছে যাওয়া আশ্চর্যের কিছুই নয়। তাই বেশী সময় বাইরে অবস্থান করা সম্ভব ছিল না। বিধায় পুনরায় আমরা গাড়ীতে আরোহণ করি।

হযরত শুয়াইব (আঃ)এর উপত্যকায়

আমাদের সামনের মঞ্জিল 'ওয়াদিয়ে শুয়াইব (আঃ)'। সুন্দরের লীলাভূমি এ উপত্যকা। এখান পর্যন্ত পৌঁছতে কয়েকটি পাহাড়ী পথ অতিক্রম করতে হয়। পথটি সবুজ শ্যামল একটি পাহাড় প্রদক্ষিণ করতে করতে চূড়ায় উঠে গেছে। সড়কের উভয় দিকে ডুমুর এবং যাইতুনের সুদৃশ্য বৃক্ষের সারি সড়কের উপর ছায়া বিস্তার করে আছে। বৃক্ষ সারির নিবিড় পাতা ভেদ করে করে সূর্যরশ্মি সড়কে পতিত হয়েছে। সম্পূর্ণ উপরে উঠার পর এই উপত্যকা আরম্ভ হয়। এই উপত্যকাতেই হযরত শুয়াইব (আঃ)এর মাযার।

পবিত্র মাযারের এই জায়গা বর্তমানে একটি সেনা ছাউনিরূপে ব্যবহৃত হচ্ছে। সেখানে সাধারণের প্রবেশ নিষেধ। মালিক আফজাল সাহেব বিশেষভাবে অনুমতি সংগ্রহ করে আমাদেরকে ভিতরে নিয়ে যান। কিছুদূর যাওয়ার পর আমরা বামদিকে মোড় নিলে ছোট একটি মসজিদ দেখতে পাই। সেই মসজিদের অভ্যন্তরে হযরত শুয়াইব (আঃ)এর মাযার। সেখানে হাজির হয়ে সালাম পেশ করার সৌভাগ্য নসীব হয়। হযরত ইউশা (আঃ)এর মাযারের মত এ কবরের দৈর্ঘ্যও অস্বাভাবিক।

হযরত শুয়াইব (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)এর শ্বশুর। হযরত মূসা (আঃ) নবুয়্যাত প্রাপ্তির পূর্বে মিসর থেকে আত্মগোপন করে তাঁরই গৃহে আশ্রয় গ্রহণ করেন এবং তাঁর মেয়েকে বিয়ে করেন। যার বিস্তারিত আলোচনা পবিত্র কুরআনের সূরা কাসাসে বিবৃত হয়েছে।

হযরত শুয়াইব (আঃ) যে জাতির নিকট নবীরূপে প্রেরিত হন, পবিত্র কুরআনে তাদেরকে কোথাও 'মাদয়ান' এবং কোথাও 'আসহাবুল আইকা'

বলা হয়েছে। কোন কোন তাফসীরবিদের মতে এরা ভিন্ন ভিন্ন দুটি সম্প্রদায়। হযরত শুয়াইব (আঃ) প্রথমে মাদয়ান এবং পরে আসহাবুল আইকার নিকট প্রেরিত হন। হযরত মাওলানা সুলায়মান নদভী (রহঃ) গবেষণান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন। তাঁর মত এদিকেই প্রবল যে, মাদয়ান জর্দানের সীমানাতে অবস্থিত, আর আইকা তাবুকেরই আরেকটি নাম। আর কোন কোন তাফসীরবিদের মতে এটি একই সম্প্রদায়ের দুটি নাম। মাদয়ান তাদের বংশীয় নাম। কেননা এরা হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর পুত্র মাদয়ানের বংশধর। আর আসহাবুল আইকা (বন অধিপতি) তাদের ভৌগলিক নাম। এরা যে অঞ্চলে বাস করত সেখানে নিবিড় জঙ্গল ছিল। যে কারণে তাদেরকে আসহাবুল আইকা বলা হয়। হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সিউহারভী (রহঃ)এর মত এদিকেই প্রবল।

এই মাযার হযরত শুয়াইব (আঃ)এর হওয়ার বিষয়টি কতটুকু সঠিক তা নিশ্চিতভাবে বলা কঠিন। ইয়ামানের হাযরামাউত নগরীর অদূরে 'শাবাম' নামক স্থানেও হযরত শুয়াইব (আঃ)এর নামে একটি কবর রয়েছে। তবে আবদুল ওয়াহাব নাজ্জার কাসাসুল আম্বিয়া গ্রন্থে এটি হযরত শুয়াইব (আঃ)এর কবর হওয়ার বিষয়টিকে সংশয়পূর্ণ বলেছেন।

হযরত শুয়াইব (আঃ)এর কবর ইয়ামানে না হয়ে বরং জর্দান বা সিরিয়ার কোন অঞ্চলে হওয়াই অধিক যুক্তিযুক্ত। কেননা মাদয়ান এবং আইকা একই স্থানের দুই নাম হোক চাই দুটি পৃথক পৃথক স্থান, হোক তার মূল অবস্থান আরবের উত্তর পশ্চিমে জর্দান ও ফিলিস্তিনের মাঝামাঝি বলা হয়েছে। বিধায় এসব অঞ্চলের সাথে ইয়ামানের কোন সম্পর্ক নেই। এ কথাটি এ অঞ্চলে খুব প্রসিদ্ধ যে, হযরত শুয়াইব (আঃ)এর মাযারের জায়গাটি মাদায়েনেরই একটি অঞ্চল। বরং আমরা যখন হযরত শুয়াইব (আঃ)এর মাযার থেকে বাইরে বের হই, তখন মালিক আফজাল সাহেব আমাদেরকে ছোট একটি কূয়া দেখালেন। কূয়াটির মুখ বাঁধানো নয়, তবে তা লোহার একটি ঢাকনা দিয়ে এমনভাবে ঢাকা আছে যে, উপর থেকে তাকে একটি ম্যানহোল বলে মনে হয়। মালিক সাহেব বললেন, এই অঞ্চলে এই কূপটি পবিত্র

কুরআনের আয়াত ঃ وَلَمَّا وَرَدَ مَاءَ مَدْيَنَ –তে বর্ণিত কূপ বলে প্রসিদ্ধ। যেই কূপের নিকট হযরত মূসা (আঃ) পৌঁছলেন, আর তখন হযরত শুয়াইব (আঃ)এর কন্যাদ্বয় পানির পাত্র ভরতে চাচ্ছিলেন। কিন্তু ভীড়ের কারণে ভরতে পারছিলেন না। তখন হযরত মূসা (আঃ) তাদেরকে পানি ভরে দিলেন। আর এখান থেকেই হযরত শুয়াইব (আঃ)এর পরিবারের সঙ্গে তাঁর পরিচয়ের সূত্রপাত হয়।

এই কূপ বাস্তবিকই সেই কূপ কিনা, তা নিশ্চিত হওয়ার সঠিক কোন পথ নেই। তবে বিভিন্ন লক্ষণের ভিত্তিতে বিষয়টি খুবই সন্দেহপূর্ণ বলে মনে হয়। কেননা পবিত্র কুরআনের বর্ণনাভঙ্গীতে প্রতীয়মান হয় যে, কূপটি হযরত শুয়াইব (আঃ)এর বাসস্থান থেকে অনেক দূরে ছিল। কিন্তু এ কূপটি হযরত শুয়াইব (আঃ)এর মাযার থেকে আনুমানিক পঁচিশ–ত্রিশ ধাপের অধিক নয়। তবে এর একটি ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, তাঁর মাযার তাঁর সেই বাসস্থানে হয়নি, যেখানে তিনি হযরত মূসা (আঃ)এর অবস্থানকালে বাস করতেন। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

যাই হোক আমাদের মত ভক্তদের জন্য এতটুকু সম্ভাবনাময় সম্পর্কও কম কিসের? এ সম্পূর্ণ ভূখণ্ড আম্বিয়ায়ে কেরামের ভূখণ্ড। এখানে পৌঁছে মন ও নয়ন যে আবেগ ও পুলক অনুভব করে তা শব্দ ও বাক্যের আয়ত্বের বাইরে। আর মনের আবেদন তো ছিল—(কবিতা)

قِفَا نَبْكِ مِنْ ذِكْرَى حَبِيْبٍ وَ مَنْزِلِ

"দাঁড়াও ! বন্ধু ও তাঁর বাসগৃহের স্মৃতি স্মরণ করে
কিছুক্ষণ অশ্রু ঝরানোর অবকাশ দাও।"

আগওয়ারে

জর্দানের ভৌগলিক অবস্থান এইরূপ ঃ পশ্চিমে ফিলিস্তিন এবং বাইতুল মুকাদ্দাস। বর্তমানে তা আমাদের পাপের ফলে ইসরাঈলের দখলে। জর্দান নদীর পশ্চিম তীরের ওপারে সম্পূর্ণ পাহাড়ী অঞ্চল। তার পূর্বেও পাহাড়ী অঞ্চল। এই উভয় পাহাড়ী অঞ্চলের মধ্য দিয়ে উত্তর দক্ষিণ দিকে একটি ভূখণ্ড চলে গেছে। ভূখণ্ডটি জর্দান নদীর পূর্ব তীরে

অবস্থিত। অঞ্চলটি অত্যন্ত উর্বর। এ ভূখণ্ডটিকে আগওয়ার (ভাটি অঞ্চল) বলা হয়। এখানে অনেক সাহাবীর মাযার এবং বিভিন্ন ঐতিহাসিক স্থান রয়েছে।

'ওয়াদিয়ে শুয়াইব (আঃ)' থেকে বের হয়ে আমরা আগওয়ার অভিমুখে যাত্রা করি এবং সর্বপ্রথম এ অঞ্চলের ছোট্ট একটি শহর 'আশ শাওফাতুল জুনুবিয়াতে' যাই। এখান থেকে একটি সড়ক সোজা উত্তর দিকে চলে গেছে। যার ডান দিকে (পূর্বে) ছোট ছোট পাহাড়ের সারি। বাম দিকে (পশ্চিমে) কয়েক কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত ময়দান। সেখানে বহুদূর পর্যন্ত ক্ষেত আর বাগানের সারি। এই ক্ষেত আর বাগান জর্দান নদীতে গিয়ে শেষ হয়েছে। যার পশ্চিম প্রান্তে ফিলিস্তিন এবং নাবলসের আকাশচুম্বী পাহাড় দৃষ্টিগোচর হতে থাকে। সেগুলো বর্তমানে ইসরাঈলের দখলে।

আমরা 'আশ্‌শাওফাতুল জুনবিয়াহ' থেকে সামান্য সম্মুখে অগ্রসর হলে ছোট একটি গ্রামের পাশে জীর্ণ শীর্ণ ও ছোট একটি মসজিদ দেখতে পাই। মসজিদের মিনারে অনেকগুলো গুলির চিহ্ন রয়েছে। পরে জানতে পারি যে, ১৯৬৭ সালের আরব ইসরাঈল যুদ্ধের সময় ইসরাঈলের সৈন্য এখান পর্যন্ত প্রবেশ করে। এ অঞ্চলকে ইসরাঈলের আধিপত্য থেকে মুক্ত করার জন্য জর্দানের সৈন্য বাহিনী জান বাজি রেখে তাদের মোকাবেলা করে। পরিশেষে অনেক জানবাজ সৈন্য আপন জীবনের নজরানা পেশ করে ইসরাঈলের নগ্ন থাবা থেকে মাতৃভূমি স্বাধীন করে এবং ইসরাঈলের সৈন্য জর্দান নদীর অপর পার পর্যন্ত পিছু হটে যায়।

আজ জুমার দিন। মসজিদে আবু উবাইদা, যে মসজিদে হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাযিঃ)এর মাযার অবস্থিত, আমাদের সেখানে জুমার নামায আদায় করার ইচ্ছা ছিল। তাই দ্রুত ভ্রমণ করে প্রায় পৌনে বারোটার সময় আমরা মসজিদে আবু উবাইদাতে পৌছি।

'মসজিদে আবি উবাইদা' নামে প্রসিদ্ধ মসজিদেই আমরা জুমার নামায আদায় করি। সেই মসজিদের একাংশে আমীনে উম্মত হযরত আবু উবাইদা ইবনুল জাররাহ (রাযিঃ) বিশ্রামরত আছেন। মসজিদটি বেশ

প্রশস্ত। জুমার খুৎবার সময় প্রচুর মুসুল্লীর সমাগম হয় এবং মসজিদ পূর্ণ হয়ে যায়। খুৎবাতে ইমাম সাহেব জিহাদের ফযীলত এবং আলমে ইসলামের মুসলমানদের অধঃপতনের কারণসমূহ অত্যন্ত মর্মস্পর্শীভাবে আলোচনা করেন। তবে নামাযের নির্ধারিত সময় মত খুৎবা শেষ করে নামায আরম্ভ করে দেন।

নামাযান্তে মসজিদের ভিতরাংশের—ডান দিকে হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর মাযারে হাজির হওয়ার সৌভাগ্য নসীব হয়। উভয় জাহানের সর্দার নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই প্রাণ উৎসর্গকারী সাহাবীর মাযার যিয়ারত করার মুহূর্তে মনে যে অবস্থা বিরাজ করে তা বর্ণনাতীত। তখন রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগের এবং তার পরবর্তীকালের অনেক ঘটনাই স্মৃতিপটের বাতায়নকে উদ্ভাসিত করে। সেগুলো ছিল এক অমূল্য ইতিহাস। কয়েক মুহূর্তের মধ্যে দৃষ্টির সম্মুখেস্মৃতির সে পাতাগুলো উল্টাতে থাকি। আর হৃদয়ে ভক্তি ও ভালবাসার এক প্লাবন উথলে ওঠে।

হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাযিঃ)

হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামর সেসব মহান সাহাবীদের অন্যতম, যাঁদের মহান ব্যক্তিত্ব সে যুগের সকল শ্রেষ্ঠ গুণাবলী এবং প্রশংসনীয় মর্যাদার সমন্বয় ছিল। তিনি সাবিকীনে আওয়ালীনের অন্যতম ছিলেন। তিনি সে সময় ইসলাম গ্রহণ করেন, যখন মুসলমানদের সংখ্যা হাতে গোনা যেত। তিনি সেই সৌভাগ্যবান দশ সাহাবীর অন্তর্গত, যাঁদেরকে 'আশারায়ে মুবাশশরা' (বেহেশতের সুসংবাদপ্রাপ্ত দশজন) বলা হয়। যাঁদেরকে স্বয়ং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জান্নাতী হওয়ার বিষয়ে সুসংবাদ প্রদান করে। তিনি সেসব সাহাবীদের মধ্যেও গণ্য যাঁদের দুবার হিজরত করার সৌভাগ্য হয়েছে। প্রথমে তিনি হাবশায় হিজরত করেন। পরে মদীনায় হিজরত করেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তিনি কেবলমাত্র যুদ্ধে অংশগ্রহণই করেননি, বরং সব সময় প্রাণ বাজী রেখে নবীপ্রেম এবং তাঁর

আনুগত্য ও অনুসরণের চিরস্থায়ী আদর্শ প্রতিষ্ঠা করেন।

বদর যুদ্ধকালে তাঁর পিতা মক্কার কাফিরদের সঙ্গে মুসলমানদের বিপক্ষে লড়তে এসেছিল। যুদ্ধ চলাকালে সে স্বীয় পুত্রকে (হযরত আবু উবাইদা) শুধু তালাশই করছিল না বরং যে কোন ভাবে তাঁর সামনাসামনি হওয়ারও চেষ্টায় ছিল। হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) যদিও তাঁর পিতার কুফুরীর কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন, তবে তিনি নিজ হাতে তার উপর অসি চালনা করা পছন্দ করছিলেন না। তাই যখনই সে সম্মুখে এসে মোকাবেলা করতে চাইত, তখনই তিনি তাকে এড়িয়ে যেতেন। কিন্তু পিতা তাঁর পিছু ছাড়ল না। ফলে তাঁকে মোকাবেলা করতেই হল। আর যখন মোকাবেলা মাথার উপর এসেই পড়ল, তখন আল্লাহর সাথের সম্পর্ক তাঁর পথের প্রতিবন্ধক সকল সম্পর্ককে ছিন্ন করে দিল। পিতা পুত্রের তরবারী পরস্পরের বিরুদ্ধে উত্তোলিত হল। ঈমান কুফরের উপর বিজয়ী হল। পিতা পুত্রের হাতে নিহত হল।

উহুদ যুদ্ধের সময় কাফেরদের অতর্কিত ও অকস্মাৎ আক্রমণে উভয় জগতের সরদার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শিরস্ত্রাণের দুটি টুকরা তাঁর পবিত্র মুখমণ্ডলে বিদ্ধ হলে হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) তা আপন দাঁতে ধরে বের করেন। এমনকি এই টানাটানিতে তাঁর সম্মুখের দুটি দাঁত পড়ে যায়। দাঁত পড়ে যাওয়ার পর মুখশ্রী লোপ পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রত্যক্ষদর্শীদের বর্ণনামতে দাঁত পড়ে যাওয়ার ফলে তাঁর মুখশ্রী কমতো হয়ই নাই, বরং তা আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। লোকেরা বলত যে, দন্তহীন কোন লোককে হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর থেকে অধিক সুশ্রী দেখা যায়নি।

ইয়ামানের অধিবাসীরা ইসলাম কবুল করে তাদের নিকট একজন শিক্ষক পাঠানোর জন্য আবেদন করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাযিঃ)এর উভয় হস্ত ধারণ করে বলেন ঃ

“এ ব্যক্তি এই উম্মতের আমীন।” (বিশ্বস্ত–আমানতদার)

তাছাড়া হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এই উক্তি সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম শরীফে বর্ণিত হয়েছে—

"প্রত্যেক উম্মতেই একজন 'আমীন' (বিশ্বস্ত–আমানতদার) থাকে, এ উম্মতের 'আমীন' আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ।"

একদা হযরত আয়েশা (রাযিঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট তাঁর সাহাবীদের মধ্যে সর্বাধিক প্রিয় কে ছিলেন? হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন ঃ আবু বকর। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তারপর কে? তিনি বললেন ঃ উমর। পুনরায় জিজ্ঞাসা করা হল, তারপর কে? উত্তরে হযরত আয়েশা (রাযিঃ) বললেন ঃ আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ।

হযরত হাসান বসরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে বলেছিলেন ঃ

"আমি চাইলে একমাত্র আবু উবাইদা ছাড়া তোমাদের প্রত্যেকের স্বভাবের কোন না কোন ত্রুটি ধরতে পারি।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পরলোকগমনের পর সাকীফায়ে বনী সায়েদাতে যখন সাহাবায়ে কেরামের সমাবেশ হয় এবং খেলাফত বিষয়ে আলোচনা চলতে থাকে, তখন হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) খেলাফতের জন্যে দুটি নাম পেশ করেন। এক. হযরত উমর (রাযিঃ) দুই. আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাযিঃ)। কিন্তু হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) বর্তমান থাকাকালে অন্য কারো সম্পর্কে একমত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না। সকল মুসলমান তাঁর ব্যাপারেই ঐক্যমত পোষণ করেন। তবে এ স্থলে হযরত আবু বকর (রাযিঃ)এর পক্ষ থেকে হযরত আবু উবাইদার নাম পেশ হওয়ায় সাহাবায়ে কেরামের দৃষ্টিতে তাঁর উচ্চ মর্যাদা স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) তাঁর খেলাফতকালে সিরিয়ার রণক্ষেত্রের দায়িত্ব হযরত আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাযিঃ)এর হাতেই ন্যস্ত করেন। সুতরাং জর্দান ও সিরিয়ার সিংহভাগ অঞ্চল তাঁরই পবিত্র হাতে জয় হয়। মাঝখানে ইয়ারমুক যুদ্ধ চলাকালে হযরত আবু বকর (রাযিঃ) হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাযিঃ)কে ইরাক থেকে সিরিয়া পাঠান, তখন হযরত খালিদ (রাযিঃ)কে সিরিয়ার যুদ্ধক্ষেত্রের আমীর নিযুক্ত করেন। কিন্তু হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁর খেলাফতকালের

সূচনাতেই হযরত খালিদ (রাযিঃ)কে সেনাপতির পদ হতে বরখাস্ত করে হযরত আবু উবাইদাকে আমীর নিযুক্ত করেন। তারপর সম্পূর্ণ সিরিয়া তাঁর নেতৃত্বেই বিজয় হয়। হযরত খালিদ (রাযিঃ) তাঁর অধীনে জিহাদে অংশগ্রহণ করেন। হযরত আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাযিঃ) হযরত উমর (রাযিঃ)এর পক্ষ হতে সিরিয়ার গভর্নরের দায়িত্বও পালন করেন।

সিরিয়ার ভূখণ্ড তার উর্বরতা, জলবায়ু এবং প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের দিক থেকে আরবের মরুবাসীদের জন্য ভূস্বর্গের চেয়ে কম ছিল না। অপরদিকে সেখানে সে যুগের শ্রেষ্ঠতম সভ্যতা ও সংস্কৃতির অর্থাৎ রোমান সভ্যতার প্রাধান্য ছিল। কিন্তু উভয় জাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাহচর্যের ফয়েজে যেই চির অম্লান রং সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের মনমগজে ধারণ করেছিলেন তাতে তাঁরা এত অধিক পরিপক্ক ছিলেন যে, সিরিয়ার বিচিত্র রংসমূহ তাঁদের দুনিয়া বিমুখতা, অল্পতুষ্টি এবং পরকালের নিরবচ্ছিন্ন চিন্তায় অণু পরিমাণও প্রভাব ফেলতে পারেনি। এর বাস্তবতা হযরত আবু উবাইদাহ ইবনে জাররাহ (রাযিঃ)এর একটি ঘটনা থেকে ভাস্বর হয়ে ওঠে।

আবু উবাইদা (রাযিঃ) সিরিয়ার গভর্নর থাকাকালীন সময়ে হযরত উমর (রাযিঃ) সিরিয়া ভ্রমণে যান, তখন একদিন হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁকে বললেন ঃ 'আমাকে আপনার ঘরে নিয়ে চলুন।'

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) উত্তরে বললেন, 'আপনি আমার ঘরে গিয়ে কি করবেন? সেখানে গিয়ে হয়ত আমার দুরাবস্থা দেখে আপনার অশ্রু বিসর্জন করা ছাড়া কোন লাভ হবে না।'

কিন্তু হযরত উমর (রাযিঃ) পীড়াপীড়ি করায় তিনি তাঁকে স্বগৃহে নিয়ে যান। হযরত উমর (রাযিঃ) গৃহে প্রবেশ করে কোন প্রকার আসবাবপত্র দেখতে পেলেন না। গৃহটি সকল প্রকার আসবাব–পত্র থেকে শূন্য ছিল। হযরত উমর (রাযিঃ) অভিভূত হয়ে বললেন ঃ 'আপনার আসবাব–পত্র কোথায়? এখানে তো শুধুমাত্র একটি অশ্বের পৃষ্ঠাবরনী, একটি পেয়ালা এবং একটি মশক দেখছি। আপনি সিরিয়ার গভর্নর। আপনার নিকট আহার করার মত কিছু আছে কি?

একথা শুনে হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) একটি তাকের দিকে

অগ্রসর হলেন এবং সেখান থেকে শুকনো রুটির কয়েকটি টুকরা তুলে আনলেন। হযরত উমর (রাযিঃ) এ অবস্থা দেখে কেঁদে ফেললেন। তখন হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) বললেন ঃ

'আমিরুল মুমিনীন! আমি তো পূর্বেই আপনাকে বলেছিলাম যে, আপনি আমার অবস্থা দেখে অশ্রু বিসর্জন করবেন। আসল কথা এই যে, মানুষের জন্য এতটুকু সামানাই যথেষ্ট, যা তাকে তার শয়নক্ষেত্র (কবর) পর্যন্ত পৌঁছে দেয়।

হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ আবু উবাইদা! দুনিয়া আমাদের সবাইকে পাল্টে দিয়েছে। কিন্তু তোমাকে পাল্টাতে পারেনি।

আল্লাহু আকবর! এই সেই আবু উবাইদা, যাঁর নামে রোম সম্রাট কায়সারের দোর্দণ্ড শক্তি প্রকম্পিত ছিল, যাঁর হাতে রোমের বিশাল বিশাল কেল্লা জয় হচ্ছিল, যাঁর পদতলে প্রত্যহ রোমান ধনসম্পদের ভাণ্ডারসমূহ স্তূপীকৃত হচ্ছিল। তিনিই রুটির শুকনা টুকরা খেয়ে জীবন যাপন করছিলেন। দুনিয়ার স্বরূপ সঠিকভাবে অনুধাবন করে তাকে এরূপ লাঞ্ছিত ও অপদস্থ কেউ করে থাকলে, তা একমাত্র সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের প্রাণ উৎসর্গকারী এ সকল সাহাবীরাই করেছিলেন।

شان آنکھوں میں نہ جچتی تھی جہاں داروں کی

দুনিয়াদারদের প্রতাপের কোন গুরুত্বই তাদের চোখে ছিল না।

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) সেসব সৌভাগ্যবানদের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা চীর সত্যবাদী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র জবানে জান্নাতে প্রবেশ করার সুসংবাদ লাভ করেছিলেন। আর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দেওয়া কোন সংবাদে সামান্যতম সংশয় পোষণ করার প্রশ্নও তাঁদের ছিল না। এতদসত্ত্বেও তাঁর খোদাভীতি এমন প্রবল ছিল যে, কখনো কখনো তিনি বলতেন ঃ

"আহা! আমি যদি একটি ভেড়া হতাম, আমার মনিব আমাকে যবেহ করে আমার গোশত ভক্ষণ করত, আর আমার গোশতের ঝোল পান করত।"

হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁকে এত অধিক মূল্যায়ন করতেন যে, একবার তাঁর পরবর্তী খলীফা নিয়োগের প্রশ্ন উঠলে তিনি বলেন ঃ আবু উবাইদার জীবদ্দশায় আমার অন্তিম মুহূর্ত এসে গেলে কারো সঙ্গে পরামর্শ করার প্রয়োজনও আমার হবে না, আমি তাঁকে আমার পরবর্তী খলীফা বানানোর জন্য মনোনীত করে যাব। তাঁকে মনোনীত করার ব্যাপারে আল্লাহ পাক আমাকে প্রশ্ন করলে আমি নিবেদন করতে পারব যে, আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে একথা বলতে শুনেছি যে, "প্রত্যেক উম্মাতের একজন 'আমীন' থাকে, আর এ উম্মাতের আমীন আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ।"

যখন জর্দান ও সিরিয়ার সেই ঐতিহাসিক প্লেগ (মহামারী) বিস্তার লাভ করে, যাতে হাজার হাজার মানুষ মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছিল, তখন হযরত উমর (রাযিঃ) হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর নিকট পত্র প্রেরণ করেন, যার বক্তব্য ছিল এই ঃ

"সালাম বাদ, আমার একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে, সে ব্যাপারে আপনার সঙ্গে আমি সরাসরি আলোচনা করতে চাই। তাই আমি অতীব তাকীদ সহকারে আপনাকে বলছি, আমার এ চিঠি পড়ে শেষ করে তা হাত থেকে রাখামাত্র অনতিবিলম্বে আপনি আমার নিকট রওনা করবেন।"

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) আজীবন আমীরের অনুগত থাকেন। কিন্তু এ পত্র দেখামাত্র তিনি অনুধাবন করেন যে, হযরত উমর (রাযিঃ)এর সেই ভীষণ প্রয়োজন (যে জন্য আমাকে পবিত্র মদীনায় আহ্বান করেছেন) শুধু এই যে, তিনি আমাকে প্লেগাক্রান্ত এ অঞ্চল থেকে বের করে নিয়ে যেতে চান। সুতরাং তিনি পত্র পাঠ করে সঙ্গীদেরকে বললেন ঃ

عرفت حاجة اميرالمؤمنين انه يريد أن يستبقى من ليس بباق –

অর্থ ঃ আমি আমীরুল মুমিনীনের প্রয়োজন উপলব্ধি করতে পেরেছি। তিনি এমন এক ব্যক্তিকে বাঁচিয়ে রাখতে চান, মূলতঃ যে বাঁচবার নয়।

একথা বলে তিনি হযরত উমরের (রাযিঃ) পত্রের এই উত্তর লিখে পাঠান—

يا أمير المؤمنين انى قدعرفت حاجتك إلى، و انى فى جند من المسلمين لا أجد بنفسى رغبة عنهم، فلست أريد فراقهم حتى يقضى الله فى وفيهم أمره و قضاءه فخلنى من عزيمتك يا امير المؤمنين، و دعنى فى جندى-

অর্থ ঃ "আমীরুল মুমিনীন! যে জরুরতে আপনি আমাকে আহ্বান করেছেন, সে বিষয়ে আমি অবগত আছি। কিন্তু আমি মুসলমানদের এমন এক সেনাদলের মধ্যে অবস্থান করছি, যাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কোন আগ্রহ আমি আমার অন্তরে পাই না। তাই আমি তাঁদেরকে ত্যাগ করে তখন পর্যন্ত আসতে চাই না, যতক্ষণ না আল্লাহ্ তাআলা আমার এবং তাঁদের বিষয়ে স্বীয় তাকদীরের চূড়ান্ত ফায়সালা করেন। বিধায় হে আমীরুল মুমিনীন! আপনি আমাকে আপনার এই তাকীদপূর্ণ নির্দেশ থেকে ক্ষমা করুন এবং আমাকে আমার সেনাবাহিনীর মধ্যেই অবস্থান করতে দিন।"

হযরত উমর (রাযিঃ) পত্র পাঠ করলেন। তার চক্ষু অশ্রুতে ভরে গেল। পাশে উপবেশনকারী লোকেরা জানত যে, পত্রটি সিরিয়া থেকে এসেছে। হযরত উমর (রাযিঃ)কে অশ্রুসিক্ত দেখে তারা জিজ্ঞাসা করলেন ঃ 'আবু উবাইদা (রাযিঃ) কি ইন্তেকাল করেছেন?' হযরত উমর (রাযিঃ) বললেন ঃ 'ইন্তেকাল তো করেননি ঠিক তবে এমন মনে হচ্ছে যেন তিনি ইন্তেকাল করবেন।' তারপর হযরত উমর (রাযিঃ) দ্বিতীয় পত্র লিখলেন ঃ

سلام عليك ام بعد فانك انزلت الناس ارضا عميقة فارفعهم الى ارض مرتفعة نزهة -

অর্থ ঃ 'সালাম বাদ! আপনি লোকদেরকে ঢালু ভূমিতে অবস্থান করাচ্ছেন। এখন তাদেরকে নির্মল বায়ুসম্পন্ন কোন উঁচু স্থানে স্থানান্তর করুন।'

হযরত আবু মুসা আশআরী (রাযিঃ) বলেন ঃ 'এ পত্র হযরত আবু উবাইদার নিকট পৌঁছলে তিনি আমাকে ডেকে বললেন ঃ 'আমীরুল মুমিনীনের পক্ষ থেকে এ পত্র এসেছে। এখন আপনি এমন কোন উপযুক্ত স্থান সন্ধান করুন, যেখানে সেনাদলকে অবস্থান করানো যেতে পারে। আমি সেই জায়গার সন্ধানে বের হওয়ার জন্য প্রথমে আমার ঘরে যাই। গিয়ে দেখি আমার স্ত্রী প্লেগে আক্রান্ত হয়েছেন। ফিরে এসে হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)কে বিষয়টি জানালে তিনি নিজেই সেই জায়গার খোঁজে বের হতে ইচ্ছা করলেন। উটের পিঠে হাওদা বসালেন। তিনি হাওদার রেকাবীতে মাত্র পা রেখেছেন এমতাবস্থায় তাকেও প্লেগ আক্রমণ করে বসে। এবং সেই প্লেগ রোগেই তাঁর মৃত্যু হয়। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাকেও সন্তুষ্ট করেছেন।

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর মাযার মসজিদের ডান প্রাচীর সংলগ্ন ছোট একটি কক্ষে অবস্থিত। সে কক্ষে প্রাচীন কিছু লিখিত ফলকও রক্ষিত আছে, যেগুলো সেখান থেকেই বের হয়েছিল। কিন্তু সেগুলোর লেখা পরিষ্কার পড়া যায় না।

মসজিদ থেকে বের হলে ডান দিকে বিশাল বিস্তৃত ও প্রশস্ত একটি কবরস্থান রয়েছে। তার মধ্যে দূর-দূরান্ত পর্যন্ত প্রাচীন ও বিধ্বস্ত কবরসমূহের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হয়। এ অঞ্চলের লোকদের মধ্যে প্রসিদ্ধ আছে যে, এতে অনেক সাহাবী এবং আমওয়াসের প্লেগের অনেক শহীদ সমাধিস্থ হয়েছেন। এখানে সংক্ষিপ্তভাবে সকল কবরবাসীকে সালাম জানানোর এবং তাঁদের জন্য ফাতেহা পাঠ করার সৌভাগ্য হয়।

হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রাযিঃ)

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর মসজিদ থেকে বের হয়ে আমরা উত্তর দিকগামী সড়কে পুনরায় সফর শুরু করি। কিছুক্ষণ যাওয়ার পর ডান দিকে হযরত যাররার বিন আযওয়ার (রাযিঃ)এর মাযার। ইনিও সেসব মুজাহিদ সাহাবাদের অন্যতম যাঁদের শৌর্য-বীর্যে সিরিয়ার বিজয় ইতিহাস পূর্ণ হয়ে আছে। ওয়াকেদী প্রণীত 'ফুতুহুশ শাম' গ্রন্থের মূল নায়কই হলেন হযরত যাররার (রাযিঃ)। হযরত খালিদ (রাযিঃ)এর সেই

বিশিষ্ট সঙ্গী যাঁদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, যুদ্ধের সময় তাঁরা লৌহবর্ম পরিধান করা তো দূরের কথা, বরং দেহ থেকে জামা পর্যন্ত খুলে রাখতেন। এবং খালি দেহে তাঁরা লড়তে থাকতেন। তাঁর মৃত্যুর স্থান ও কাল ঐতিহাসিকভাবে সংশয়পূর্ণ। হাফেজ ইবনে হাজার (রহঃ) এ বিষয়ে ঐতিহাসিকদের বিভিন্ন উক্তি নকল করেছেন। যার কোনটি দ্বারা জানা যায় যে, তিনি ইয়ামামার যুদ্ধে শহীদ হয়েছেন। কোনটি দ্বারা জানা যায় যে, জানাদাইনের যুদ্ধে তিনি শহীদ হন। কেউ বলেন ঃ তিনি ইয়ারমুক যুদ্ধে শামিল ছিলেন এবং পরে দিমাশকে তাঁর মৃত্যু হয়। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রাযিঃ)এর মাযার

এখান থেকে উত্তর দিকে প্রায় দু'তিন কিলোমিটার পথ অতিক্রম করার পর বামদিকে একটি ভবন দৃষ্টিগোচর হয়। ভবনটি সবুজ শ্যামল ক্ষেত ও উদ্যানের মাঝে অবস্থিত। এর মধ্যে জর্দান বিজয়ী হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রাযিঃ)এর মাযার।

হযরত শুরাহবিল বিন হাসানার নাম তাঁর মাতার সাথে সম্পৃক্ত। তাঁর মাতার নাম ছিল হাসানা। তিনিও প্রথম যুগের সেসকল মুসলমানদের অন্যতম, যাঁরা প্রথমে হাবশায় হিজরত করেন এবং পরে মদীনা মুনাওওয়ারা হিজরত করেন। হযরত সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ) সিরিয়া বিজয়ের জন্য চারদিক থেকে বিপরীতমুখী চারটি সেনাবাহিনী প্রেরণ করেন। তার মধ্য থেকে একটি সেনাবাহিনীর প্রধান হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রাযিঃ) ছিলেন। জর্দানের বিশাল অঞ্চল তাঁর হাতেই জয় হয়। একসময় তাঁকে ফিলিস্তিনের গভর্নরও নিযুক্ত করা হয়। সিরিয়ার বিজয়সমূহে তাঁর বীরত্ব, শৌর্য-বীর্য ও সুকৌশলের ঘটনাবলী ইতিহাসে বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে। আমওয়াসের সেই মারাত্মক প্লেগে (যার আলোচনা ইতিপূর্বে করা হয়েছে) হযরত শুরাহবিল বিন হাসানাও শহীদ হন, আর এও এক অভাবনীয় ঘটনা যে, তিনি ঠিক সেই দিন মৃত্যুবরণ করেন, যেদিন হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রাযিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)এর মাযারে

হযরত শুরাহবিল বিন হাসানা (রাযিঃ)এর মাযার থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ২৭ কিলোমিটার সম্মুখে অগ্রসর হওয়ার পর 'শুনা শিমালিয়া' শহরে পৌঁছার কিছু পূর্বে হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)এর মাযার অবস্থিত। সেখানে উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্যও আমার অর্জন হয়। একটি পাহাড়ের পাদদেশে ছোট একটি সুন্দর মসজিদ। মসজিদের মেঝে সে সময় বৃষ্টির কারণে সিক্ত ছিল। ঐ মসজিদেরই উত্তরাংশে হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)এর মাযার।

হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) অতীব মর্যাদাশীল আনসারী সাহাবী, যাঁকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম اعلمهم بالحلال والحرام। (হালাল হারাম সম্পর্কে সর্বাধিক জ্ঞাত সাহাবী ব্যক্তি) সাব্যস্ত করেছেন।

তিনি পবিত্র মদীনার খাযরাজ গোত্রের লোক ছিলেন। হিজরতের পূর্বে যখন মদীনার ৭০ জন আনসারী সাহাবী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হয়ে আকাবাতে বাইআত হন, তখন তাঁদের মধ্যে হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)ও শামিল ছিলেন। তিনি তখন এত অল্প বয়সের ছিলেন যে, তাঁর দাড়িও গজায়নি। বদর যুদ্ধের সময় তাঁর বয়স ছিল ২০ বছর। প্রায় সব কটি গাযওয়াতে তিনি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে ছিলেন। তবে হুনাইনের যুদ্ধের সময় হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে মক্কাবাসীদের দ্বীন শিখানোর জন্য মক্কায় রেখে যান।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত মুআযকে অত্যন্ত ভালবাসতেন। তিনি এমন খোশ নসীব সাহাবী ছিলেন যে, একবার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলেন ঃ হে মুআয! আমি সত্য বলছি যে, আল্লাহর জন্য আমি তোমাকে ভালবাসি। একথা শুনে হযরত মুআয (রাযিঃ) উত্তরে বললেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আল্লাহর কসম! আমিও আপনাকে আল্লাহর জন্য ভালবাসি। তারপর হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ আমি কি তোমাকে এমন কিছু কালিমা শিখাবো না, যা তুমি প্রত্যেক নামাযের পর পড়বে। তা এই—

رَبِّ اَعِنِّىْ عَلٰى ذِكْرِكَ وَ شُكْرِكَ وَ حُسْنِ عِبَادَتِكَ

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম একদা ইরশাদ করেন ঃ

نعم الرجال ابو بكر، نعم الرجل عمر، نعم الرجل معاذ بن جبل –

অর্থ ঃ আবুবকর ভাল মানুষ, ওমর ভাল মানুষ, মুআয বিন জাবাল ভাল মানুষ।

হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর শেষ জীবনে হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)কে ইয়ামানের গভর্নর বানিয়ে পাঠান। সে সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেই শরীয়তের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কিত সেই প্রসিদ্ধ প্রশ্নগুলো করেন। তিনি তাঁকে প্রশ্ন করেন—কিসের ভিত্তিতে তুমি সমাধান দিবে? হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী সমাধান দিব। কোন সমস্যার সমাধান আল্লাহর কিতাবে না পেলে রাসূলের সুন্নাত মুতাবিক ফয়সালা দিব। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিজ্ঞাসা করলেন ঃ রাসূলের ফয়সালাতে তা না পেলে তখন কি করবে? হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ) বলেন ঃ নিজের বুদ্ধিতে ইজতিহাদ করব। এবং সত্যে উপনীত হতে চেষ্টার কমতি করব না। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর সিনাতে হাত মেরে বললেন ঃ আল্লাহর শোকর! যিনি রাসূলের দূতকে সে বিষয়ে তাওফীক দিয়েছেন, যা আল্লাহর রাসূলের মর্জি মোতাবেক হয়েছে।

শুধু এতটুকুই নয়, বরং হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)এর যাত্রা করার সময় হলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিদায় জানানোর জন্য নিজে তাঁর নিকট গমন করেন এবং নিজের সম্মুখে উষ্ট্রীতে আরোহণ করান। এতটুকুতেই ক্ষান্ত করেননি, বরং তাঁর উষ্ট্রী চলতে আরম্ভ করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অনেকক্ষণ তাঁর সঙ্গে সঙ্গে চলতে থাকেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জানা ছিল যে, একজন উৎসর্গপ্রাণ প্রিয়জনের সঙ্গে এটি তাঁর শেষ মুলাকাত। আজ তাঁর সেই প্রিয়জন বহু দূরে চলে যাচ্ছে। উভয় জাহানের

সরদার হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে খুব কম সময়েই আবেগ প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু এই সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখে এমন কিছু কথা বের হয়, যা নিজের প্রিয়জনের বিচ্ছেদের মুহূর্তে তাঁর হৃদয় আবেগের দর্পণ ছিল। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ

يا معاذ! انك عسى ان لاتلقانى بعد عامى هذا، اولعلك ان تمر بمسجدى اوقبرى-

অর্থ ঃ হে মুআয! হতে পারে এ বছরের পর আমার সঙ্গে তোমার সাক্ষাত হবে না। কিংবা তুমি আমার মসজিদ বা কবরের নিকট দিয়ে অতিক্রম করবে।

হযরত মুআয (রাযিঃ) কত দিন ধরেই না স্বীয় আবেগকে সংযমে রেখেছিলেন। কিন্তু রাসূলের মুখে এ কথা শুনতেই তিনি ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে আরম্ভ করলেন। পূর্বে হয়ত তিনি নিজেকে এই প্রবোধ দিয়েছিলেন যে, রাসূলের সঙ্গে তাঁর এই বিচ্ছেদ এক দেড় বছরের হবে। কিন্তু সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র মুখনিঃসৃত এ বাক্য শুনে তিনি নিশ্চিত হন যে, দুনিয়াবাসীর হেদায়েতের আলোকবর্তিকা এই প্রিয়জনকে জীবনে আর দেখতে পাবো না। এ বিচ্ছেদ অনুভূতিতে তাঁর ভিতর থেকে 'আহ' বের হয়ে আসে। নয়ন যুগল হতে অশ্রু ঝরতে থাকে। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'মুআয! কেঁদো না।' একথা বলে তিনি নিজেও তাঁর চেহারা মদীনা মুনাওওয়ারার দিকে ঘুরিয়ে নিলেন এবং বললেন ঃ

ان اولى الناس بى المتقون من كانوا وحيث كانوا -

'মুত্তাকীরা আমার নিকটতম ব্যক্তি হবে। তারা যেই হোক আর যেখানেই থাকুক না কেন।'

তারপর হযরত মুআয (রাযিঃ) ইয়ামান চলে যান এবং যখন তিনি ফিরে আসেন, তখন সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর 'মাহবুবে হাকীকী'এর সান্নিধ্যে পৌঁছে গেছেন। পরে আর হযরত

মুআয (রাযিঃ) পবিত্র মদীনায় থাকেননি। তিনি সিরিয়া যাওয়ার সংকল্প করেন। হয়ত সেখানে গিয়ে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করা শাহাদাতের মর্তবা অর্জন করা উদ্দেশ্য ছিল। কথাটি হযরত উমর (রাযিঃ) জানতে পেরে তিনি সিদ্দীকে আকবর (রাযিঃ)এর সমীপে নিবেদন করেন যে, তাঁকে মদীনা মুনাওওয়ারাতেই রেখে দিন, তাঁকে মানুষের খুব দরকার। কিন্তু হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) উত্তর দিলেন যে, তিনি একটি পথ মনোনীত করেছেন (অর্থাৎ শাহাদাতের পথ), বিধায় আমি তাকে বাধা দিতে পারি না। সুতরাং হযরত মুআয (রাযিঃ) সিরিয়া গমন করেন। সেখানে তিনি জিহাদের কাজে অংশগ্রহণ করেন। তালীম ও তাবলীগের ধারাও চালু রাখেন এবং হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রাযিঃ)এর ডান হাতরূপে কাজ করতে থাকেন।

হযরত উমর (রাযিঃ)এরও হযরত মুআয (রাযিঃ)এর সঙ্গে গভীর সম্পর্ক ছিল। তিনি বলতেন ঃ

عجزت النساء ان يلدن مثل معاذ رضـ

অর্থ ঃ নারী জাতি মুআয–এর ন্যায় সন্তান প্রসব করতে অপারগ হয়েছে।

একবার হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁর এক ক্রীতদাসকে ৪০০ স্বর্ণমুদ্রা দিয়ে বললেন ঃ এগুলো আবু উবাইদার নিকট নিয়ে যাও। তারপর কিছু সময় সেখানে অবস্থান করে দেখ, তিনি এগুলো কি করেন। ক্রীতদাসটি স্বর্ণমুদ্রাগুলো হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর নিকট নিয়ে যায়। হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) স্বর্ণমুদ্রাগুলো গ্রহণ করে হযরত উমর (রাযিঃ)এর জন্য দু'আ করেন—

"আল্লাহ তাআলা তাঁকে এর প্রতিদান দিন এবং তাঁর উপর অনুগ্রহ করুন।"

তারপর তাঁর দাসীকে বললেন, এই সাতটি স্বর্ণমুদ্রা অমুককে দিয়ে আস। এই পাঁচটি অমুককে। এভাবে সবগুলো স্বর্ণমুদ্রা তখনই বিতরণ করে দেন। ক্রীতদাসটি হযরত উমর (রাযিঃ)এর নিকট ফিরে এল। তখন হযরত উমর (রাযিঃ) পুনরায় অতগুলো স্বর্ণমুদ্রা তাকে দিয়ে বললেন,

এগুলো মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)এর নিকট নিয়ে যাও এবং পূর্বের ন্যায় দেখ তিনি কি করেন। সে হযরত মুআয (রাযিঃ)এর নিকট গেলে তিনিও একই কাজ করলেন। সব স্বর্ণমুদ্রা শেষ হওয়ার মুহূর্তে তাঁর স্ত্রী ভিতর থেকে আওয়াজ দিয়ে বললেন ঃ 'আমিও অনাথা। আমাকেও কিছু দিন।' তখন থলেতে মাত্র দুটি স্বর্ণমুদ্রা ছিল। হযরত মুআয (রাযিঃ) স্বর্ণমুদ্রা দুটি স্ত্রীর দিকে ছুড়ে দিলেন। ক্রীতদাসটি ফিরে এসে হযরত উমর (রাযিঃ)কে এই ঘটনা ব্যক্ত করলে তিনি আনন্দিত হয়ে বললেন ঃ 'এরা পরস্পর ভাই ভাই এবং একই রূপ।'

হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) যখন প্লেগে আক্রান্ত হন, তখন তিনি হযরত মুআয (রাযিঃ)কে তাঁর পরবর্তী সিরিয়ার গভর্নর নির্ধারণ করে যান। সে সময় প্লেগ অতি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছিল। তখন হযরত মুআয (রাযিঃ) লোকদের শোনালেন যে, আমি হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ কথা বলতে শুনেছি যে, তোমরা সিরিয়া অভিমুখে হিজরত করবে। তা তোমাদের হাতে জয় হবে এবং সেখানে এমন এক ব্যাধি প্রকাশ পাবে যা ফোঁড়া বা গুটি আকারে দেখা দিবে। সেই ব্যাধিতে তোমাদেরকে আল্লাহ তাআলা শাহাদত দান করবেন এবং তোমাদের আমলকে অনাবিল করবেন।

তারপর হযরত মুআয (রাযিঃ) এই দু'আ করেন যে, 'হে আল্লাহ! মুআয যদি আল্লাহর রাসূল থেকে একথা প্রকৃতই শুনে থাকে, তাহলে তাঁকে এবং তাঁর পরিবারের লোকদেরকে এই মর্যাদা প্রচুর পরিমাণে দান করুন।' সুতরাং তার ঘরে এই ব্যাধি প্রবেশ করে, যার হাত থেকে হযরত মুআয (রাযিঃ)এর পরিবারের কোন সদস্যই রক্ষা পাননি। হযরত মুআয (রাযিঃ)এর তর্জনীতে প্লেগের ফোঁড়া বের হয়। তিনি তা দেখে বলতেন ঃ 'কেউ যদি এর পরিবর্তে আমাকে লাল উটও দেয় তবুও তা আমার পছন্দ নয়।'

হযরত মুআয (রাযিঃ)কে প্লেগে আক্রান্ত দেখে এক ব্যক্তি কাঁদতে আরম্ভ করলে হযরত মুআয (রাযিঃ) তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কাঁদছ কেন? সে উত্তরে দিল ঃ 'আপনার থেকে আমি পার্থিব কোন সম্পদ লাভ করতাম এজন্য আমি কাঁদছি না, বরং সে ইলমের জন্য

আমি কাঁদছি, যা আমি আপনার নিকট থেকে অর্জন করতাম।' হযরত মুআয (রাযিঃ) বললেন, 'ইলমের জন্যও কান্না করো না। দেখ হযরত ইবরাহীম (আঃ) এমন ভূখণ্ডে জন্মগ্রহণ করেন, যেখানে কোন ইলম ছিল না। আল্লাহ পাক তাঁকেই ইলম দান করলেন। তাই আমার মৃত্যুর পর চার ব্যক্তির নিকট ইলম তালাশ করবে। তাঁরা হলেন, আবদুল্লাহ বিন মাসউদ (রাযিঃ), সালমান ফারসী (রাযিঃ), আবদুল্লাহ বিন সালাম (রাযিঃ) এবং আবু দরদা (রাযিঃ)।'

যাই হোক তাঁর দোয়া কবুল হয় এবং সেই প্লেগেই (১৮ হিজরীতে) তিনি ইন্তেকাল করেন। সে সময় তার বয়স ৩৩/৩৪ বছরের অধিক ছিল না।

ভক্তি ও ভালবাসার অবর্ণনীয় আবেগ আপ্লুত হৃদয় নিয়ে নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেই খোশনসীব সাহাবীর মাযার জিয়ারত করি। সেখান থেকে বের হয়ে আমরা দেখি যে, পশ্চিম দিকে বিস্তৃত মাঠের ওপারে দিগন্তে পাহাড়ের যেই সারি শুরু থেকে আমাদের সঙ্গে সঙ্গে চলছিল, এখানে তা অতি নিকটে এসে গেছে। আমাদের পথপ্রদর্শক বললেন, এখান থেকে জর্দান নদী সর্বমোট দেড় কিলোমিটার দূরে এবং তার পশ্চিম প্রান্ত থেকে ইসরাঈল শাসিত অঞ্চল শুরু হয়েছে। হযরত মুআয (রাযিঃ)এর পবিত্র মাযারের খাদেম বললেন, যেই পাহাড়গুলো পশ্চিম দিকে দেখা যাচ্ছে, তা নাবলুসের পাহাড়সারির একটি অংশ এবং আমাদের ঠিক সম্মুখে যেই পাহাড় তাকে 'কাওয়াকিবুল হাওয়া' বলা হয়। ঐ সব পাহাড়ে অনেক বসতি আছে। তাদের মধ্যে কিছু ফিলিস্তিনীও রয়েছে। কিন্তু পাহাড়গুলোর অনেকাংশ ইহুদী আধিপত্যবাদীদের অধীনে রয়েছে।

আমি ভাবছিলাম আগওয়ারের এই পূর্বাঞ্চলে উত্তর দক্ষিণে যেই সড়ক রয়েছে, তাতে সে সকল সাহাবায়ে কেরাম বিশ্রামরত আছেন, যাঁরা নিজেদের রক্ত ও ঘামের বিনিময়ে জর্দান, ফিলিস্তীন এবং সিরিয়াকে রোমান সাম্রাজ্যের নির্যাতন ও নিপীড়ন থেকে মুক্ত করেছিলেন। যাঁরা এ অঞ্চলকে তাওহীদের কালিমার নূর দ্বারা নূরান্বিত করার জন্য স্বীয় মাতৃভূমি ত্যাগ করে, আপনজন আত্মীয়-স্বজনকে ছেড়ে আসেন। যুদ্ধের

কষ্ট-ক্লেশ সহ্য করেন। বিশ্বের সর্ববৃহৎ সৈন্য শক্তির সঙ্গে মোকাবেলা করেন এবং পরিশেষে সেই সুপার পাওয়ার, যারা তাদের স্বর্ণ ও লৌহের জোরে গর্বিত ছিল। নিঃসম্বল সেই মরুবাসীদের দৃঢ়তা ও অবিচলতার সঙ্গে টক্কর দিয়ে খান খান হয়ে যায়। খোদাপ্রেমিক এই মুজাহিদ দল নিজেদের মিশন পূর্ণ করার পর পূর্ণ প্রফুল্লচিত্তে এই ভূখণ্ডে সুখনিদ্রায় শায়িত আছেন। কিন্তু বর্তমানে তাঁদের মাযার থেকে মাত্র কয়েক কিলোমিটার দূরে ইসরাইল তার লুটেরা আধিপত্যের পতাকা গেড়েছে। আমরা যারা সেসব সাহাবায়ে কেরামের অযোগ্য উত্তরসূরী, তারা পবিত্র এই ভূখণ্ডকে সেসব খোদার দুশমনদের হাত থেকে রক্ষাও করতে পারিনি এবং হাজার চিৎকার সত্ত্বেও এখনও তাদের হাতে আমরা এত অসহায় যে, তারা আমাদের ভূখণ্ডে যা ইচ্ছা করে যাচ্ছে। আমাদের নিকট তাদের এ আক্রমণের উত্তর ক্রোধ ও চিন্তানির্ভর দফা পেশ করা ছাড়া আর কিছু নেই। এমতাবস্থায় কি আমরা সেই মহান সাহাবায়ে কেরামকে মুখ দেখানোর যোগ্য আছি। এ কল্পনায় শরীরে একপ্রকার কম্পন এসে যায়। হায়! এ কম্পনের মধ্যেও যদি আমাদের আমলের জগতে কোনরূপ পরিবর্তন এসে আমাদের হীন অবস্থা পরিবর্তনের যোগ্যতা সৃষ্টি হত।

وصل کی ہوتی ہیں ان باتوں سے تدبیریں کہیں

آرزؤوں سے پھرا کرتی ہیں تقدیریں کہیں-

অর্থ ঃ মুখের কথায় কি প্রিয়তমার সান্নিধ্য লাভ হয়? কেবলমাত্র আকাংখায় কি ভাগ্যের পরিবর্তন হয়?

বেদনা, দুশ্চিন্তা এবং অনুশোচনার যে আবেগ, অনুভূতি এখানে এসে সৃষ্টি হয়, দীর্ঘক্ষণ তা মন ও মগজে আচ্ছন্ন হয়ে থাকে, কিন্তু আমাদের গাড়ী এর পরওয়া না করে বিকট আওয়াজ করতে করতে উত্তর দিকে ফিরে যায়।

মৃত সাগরের তীরে

এখান থেকে দীর্ঘপথ অতিক্রম করার পর আমাদের পরবর্তী মনজিল ছিল জর্দানের প্রসিদ্ধ 'মৃত সাগর'। এই ছোট সমুদ্রটি ঐতিহাসিক ও

ভৌগলিক বৈশিষ্ট্যের দিক থেকে সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ। হযরত ওয়ালিদ সাহেব কুদ্দিসা সিররুহু যখন সিরিয়া ও ফিলিস্তীন সফরে এসেছিলেন, তখন তিনি এখানেও এসেছিলেন। তাঁর মুখে আমরা বাল্যকালেই এর বিভিন্ন অবস্থা শুনেছিলাম। আমাদের অপরাপর সঙ্গীরাও এই সমুদ্র দেখতে আগ্রহী ছিল। সুতরাং আমরা আসরের সময় সমুদ্র তীরে পৌছি।

ছোট এই সমুদ্র মোট পঞ্চাশ মাইল দীর্ঘ এবং ১১ মাইল প্রশস্ত। সমুদ্র পিঠের মোট আয়তন ৩৫১ বর্গমাইল। এর গভীরতা সর্বোচ্চ ১৩০০ ফুট। ১৯৬৭ খৃষ্টাব্দের পূর্বে এর উত্তর অর্ধাংশ সম্পূর্ণ জর্দানের অন্তর্ভুক্ত ছিল এবং দক্ষিণ অর্ধাংশ জর্দান ও ইসরাইলের মধ্যে বিভক্ত ছিল। ১৯৬৭ সালের যুদ্ধের পর ইসরাইলী ফৌজ সম্পূর্ণ পশ্চিম উপকূল দখল করে নেয়।

এর ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, বড় কোন সমুদ্রের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। দৈর্ঘ্য ও প্রস্থের দিক থেকে এটিকে একটি ঝিল বলাই যথার্থ, কিন্তু এর পানি নিখাঁদ সামুদ্রিক পানি হওয়ায়, বরং এর লবণাক্ততা ও রাসায়নিক উপাদান অন্যান্য সমুদ্রের তুলনায় অধিক হওয়ায় একে 'বাহার' (সাগর) বা 'বুহাইরা' (ছোট সাগর) বলা হয়। এই সমুদ্রের আরেকটি ভৌগলিক বৈশিষ্ট্য এই যে, অন্যান্য সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে এটি ১৩০০ ফুট নীচে। এর নিকটবর্তী সাগর ভূমধ্যসাগর (বা রোম সাগর)এর উপসাগর আকাবা। কিন্তু মৃত সাগর আকাবা উপসাগরের পৃষ্ঠ থেকে ১৩০০ ফুট নীচে অবস্থিত। এতে করে এটি ভূমণ্ডলের সবচেয়ে নীচু অংশ। জর্দান নদী এই সাগরে এসেই মিলিত হয়েছে এবং আশেপাশের অন্যান্য পাহাড়ী নদীও এর সাথে মিলিত হয়েছে।

বর্তমান কালের অধুনা অনেক বিশেষজ্ঞের মতে হযরত লুত (আঃ)এর সেই জাতি, যাদের উপর তাদের পাপের কারণে আযাব নাযিল হয়েছিল বাইবেল এবং ঐতিহাসিক বিভিন্ন বর্ণনাতে যার নাম 'সদ্দুম' এবং 'আমূরা' উল্লেখ করা হয়েছে, তা এই মৃত সাগরের আশেপাশের কোথাও অবস্থিত ছিল।

যদিও প্রাচীন মুসলিম ভূগোলবিদ এবং ঐতিহাসিকগণ যেমন, আল্লামা হামভী এবং বকরী প্রমুখ সদ্দুম এবং আমূরার হালত বর্ণনা

করতে গিয়ে মৃত সাগরের কোন উল্লেখ করেননি। বরং আল্লামা কাজবিনী (রহঃ) তদীয় গ্রন্থ 'আসারুল বিলাদওয়া আখইয়ারুল ইবাদ' এ সাদ্দুমের আলোচনা করতে গিয়ে একথাও লিখেছেন যে, 'বর্তমানে সেই বস্তির এলাকাতে কৃষ্ণবর্ণের পাথর আর পাথর দেখা যায়।' এতে প্রতীয়মান হয় যে, হয় তিনি নিজে সে স্থান প্রত্যক্ষ করেছেন, নতুবা প্রত্যক্ষকারী কোন ব্যক্তির নিকট তার অবস্থা শুনেছেন। এতদসত্ত্বেও তিনি এরূপ কোন ইঙ্গিত দেননি যে, তার আশেপাশে মৃত সাগর নামে কোন সাগর রয়েছে।

কিন্তু প্রখ্যাত ইহুদী ইতিহাসবিদ জোসেফাস, যিনি হযরত ঈসা (আঃ)এর যুগের লোক, তার ইতিহাসে এ কথাই লিখেছেন যে, হযরত লূত (আঃ)এর জনপদ তথা সাদ্দুম এবং আমূরা জাতির আবাসস্থল মৃত সাগরের তীরেই অবস্থিত ছিল। সম্ভবতঃ এই তথ্যের ভিত্তিতেই ১৯২৪ সালে প্রাচ্যবিদদের একটি দল লূত (আঃ) সম্প্রদায়ের জনপদের আবিস্কারের কাজে বের হয়। তারা পুরা অঞ্চল সার্ভে করার পর চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত দেয় যে, সেসব বস্তির মধ্য থেকে সাদ্দুম, আমূরা এবং যায়ার মৃত সাগরের দক্ষিণ পূর্ব তীরে অবস্থিত ছিল এবং অবশিষ্ট বস্তি সমুদ্র গর্ভে বিলীন হয়ে যায়। তারা সমুদ্রের দক্ষিণপূর্ব তীরে খনন কার্য চালালে সেখান থেকে সেই বস্তির কিছু নিদর্শনও বের হয়। এর ভিত্তিতেই শেষ যুগের মিসরী গবেষক আবদুল ওয়াহহাব আন্ নাজ্জার তার এই সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেন যে, এই সাগরটি এভাবেই জন্মে যে, হযরত লূত (আঃ)এর জাতির উপর আযাব অবতীর্ণ হয়, তাদের বস্তি উল্টে দেওয়া হয়। তখন এখানে সমুদ্রের পানি বের হয়ে আসে এবং এ সাগরের জন্ম হয়। অন্যথা হযরত লূত (আঃ)এর পূর্বে এখানে কোন সাগর ছিল না।

নিম্নোক্ত দলীল ও নিদর্শনসমূহ তার এই সিদ্ধান্তের সমর্থন করে থাকে ঃ

১. পবিত্র কুরআনে লূত (আঃ)এর সম্প্রদায়ের জনপদের আলোচনা করতে গিয়ে আরবের অধিবাসীদেরকে স্মরণ করিয়ে দেওয়া হয়েছে যে, এই বস্তিগুলো সেই সড়কে অবস্থিত যে সড়কে তোমরা সিরিয়া যাতায়াত কর। ইরশাদ হয়েছে—

وَاِنَّهَا لَبِسَبِيۡلٍ مُّقِيۡمٍ

"আর নিঃসন্দেহে এই জনপদ সোজা পথে অবস্থিত।'

অপর এক স্থানে হযরত শুয়াইব (আঃ) এবং হযরত লূত (আঃ) উভয়ের বাসস্থান একত্রে উল্লেখ করতে গিয়ে এরশাদ করেন—

وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ

"নিঃসন্দেহে এ উভয় সম্প্রদায় স্পষ্ট পথে অবস্থিত।"

বিধায় এই বস্তিগুলোর অবস্থান স্থল এই অঞ্চলেরই কোথাও হওয়া উচিত।

২. আবদুল ওয়াহহাব আন্ নাজ্জারের সিদ্ধান্ত এই যে, এই সমুদ্র বস্তি উল্টে গিয়েই সৃষ্টি হয়েছে। কথাটি এ দিক থেকে অধিক মজবুত মনে হয় যে, এই সাগরের অন্য কোন বড় সাগরের সঙ্গে কোন প্রকার যোগাযোগ নেই। তাই অসাধারণ কোন ঘটনাই এই সাগর সৃষ্টির কারণ হবে।

৩. এই সমুদ্রের পানি অন্যান্য সমুদ্রের তুলনায় অনেক গাঢ় এবং এর লবণাক্ততাও খুব বেশী। এ বিষয়ের ধারণা, এই তথ্য থেকে করা যেতে পারে যে, অন্যান্য বড় বড় সাগরে চার থেকে ছয় শতাংশ লবণাক্ততা থাকে, কিন্তু মৃত সাগরের পানিতে লবণের গড় পরিমাণ ২৩ থেকে ২৫ শতাংশ পর্যন্ত রয়েছে। ফলে যারা এই সাগরে দীর্ঘক্ষণ গোসল করে তাদের দেহ থেকে এর রাসায়নিক উপাদানের চটচটেভাব দূর করার জন্য তাদেরকে অনেক পরিশ্রম করতে হয় এবং সাধারণ পানি দ্বারা এক আধবার গোসল করায় সহজে এই উপাদান দেহ থেকে দূর হয় না। পানির এ অস্বাভাবিক অবস্থাও অসাধারণ কোন ঘটনার প্রমাণ বহন করে।

৪. এই সাগরের একটি বৈশিষ্ট্য হলো এতে মাছ সহ অন্য কোন প্রাণী জীবিত থাকে না। কোন উদ্ভিদ উৎপন্ন হয় না। এমনকি জর্দান নদী অথবা পাহাড়ী কোন ঝর্ণার পানি যখন এতে পতিত হয়, তখন অনেক সময় এই পানির সাথে মাছও ভেসে চলে আসে কিন্তু এসব মাছ সাগরে পতিত হওয়ার সাথে সাথেই মারা যায়। বিজ্ঞানের দৃষ্টিতে সাধারণতঃ এর ব্যাখ্যা এই করা হয় যে, সমুদ্রের অস্বাভাবিক লবণাক্ততার কারণে এরূপ হয়ে থাকে এবং এর বাহ্যিক কারণ হয়ত বা এটিই। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে ইহা

হযরত লূত (আঃ)এর জাতির উপর অবতীর্ণ আযাবের প্রতিক্রিয়া হওয়া অস্বাভাবিক কিছু নয়। সাগরের এই বৈশিষ্ট্যের কারণেই একে মৃত সাগর বলা হয়। এর এই নাম গ্রীকদের যুগ থেকে চলে আসছে। আরবরা একে বাহিরায়ে লূতও বলে থাকে।

৫. আমি পূর্বে উল্লেখ করেছি যে, মৃত সাগর অঞ্চলটি ভূমণ্ডলের সর্বনিম্ন অঞ্চল। মৃত সাগরের পৃষ্ঠ সাগরের সাধারণ পৃষ্ঠ থেকে ১৩০০ ফুট নীচে। সমগ্র বিশ্বে সমুদ্র পৃষ্ঠ থেকে এত নীচু আর কোন অঞ্চল নেই। আমি এই তথ্য অনুধাবন করার সাথে সাথে পবিত্র কোরআনের এই আয়াতের দিকে আমার মনোযোগ আকৃষ্ট হয়। যার মধ্যে আল্লাহ তাআলা কওমে লূতের বস্তিসমূহের কথা উল্লেখ করতে গিয়ে এরশাদ করেছেন— وَجَعَلْنَا عَالِيَهَا سَافِلَهَا

"আমি এই পৃথিবীর সর্বোচ্চ অঞ্চলকে পৃথিবীর নিম্নাঞ্চল বানিয়ে দেই।"

সাধারণতঃ এই আয়াতের অর্থ এই মনে করা হয় যে, বস্তি উল্টে দেওয়ার ফলে তার গৃহছাদ ভূগর্ভে ঢুকে পড়ে। কিন্তু পবিত্র কুরআনের অলৌকিক এই উপস্থাপনা হয়ত একথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, বস্তির ভবনগুলোই শুধু ভূগর্ভে ঢুকে পড়েনি বরং সেই বস্তির পূর্ণ এলাকাকে পৃথিবীর নিম্নতম অঞ্চলে পরিণত করা হয়েছে। সুতরাং মৃত সাগরের উত্তর ও পূর্ব দিকের অঞ্চলসমূহে তো আমরা নিজেরাই প্রত্যক্ষ করলাম যে, সেখানে অনেক মাইল দূর থেকে ভূপৃষ্ঠ ক্রমশঃ নিচু হয়ে গেছে। ভূমির যে অংশ সমুদ্র পৃষ্ঠের সমতল সেখানে প্রতীকি বোর্ড বসানো হয়েছে। তারপর কিছু দূর পর পর ভূপৃষ্ঠের নিচুর পরিমাণ নির্দেশ করার জন্য বোর্ড বসানো হয়েছে। শেষ পর্যন্ত মৃত সাগরে পৌঁছে সর্বনিম্ন অঞ্চল চলে আসে।

আল্লাহু আকবার! এ থেকে একদিকে পবিত্র কুরআনের অলৌকিকতা প্রকাশ পায় যে, সে চৌদ্দশত বছর পূর্বে এমন এক ভৌগলিক বাস্তবতা সম্পর্কে আলোকপাত করেছে, যা বহু শতাব্দী পর ভূগোল বিশারদদের নিকট স্পষ্ট হয়েছে এবং এমনভাবে তা উপস্থাপন করেছে যে, সে যুগের

লোকদেরও এর বক্তব্যের সুস্পষ্ট অর্থ অনুধাবন করতে বিন্দুমাত্র জটিলতা দেখা দেয়নি।

অপরদিকে এ বিষয়টিও স্পষ্ট হয়ে যায় যে, এ জাতির উপর আপতিত আযাবে ইলাহীর এই ঘটনা কেয়ামত পর্যন্ত দূরদর্শীদের জন্য শিক্ষার উপকরণ হয়ে থাকবে। জনপদ উল্টে গেছে। অধিবাসী নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। কিন্তু যুগের বিস্ময়রূপে একটি সাগর আত্মপ্রকাশ করেছে, আর কেয়ামত পর্যন্তের জন্য এই ভূমি বিশ্বের নিম্নতম ভূমি হয়ে আছে।

فَتِلْكَ مَسَاكِنُهُمْ لَمْ تُسْكَنْ مِنْ بَعْدِهِمْ إِلَّا قَلِيلًا وَكُنَّا نَحْنُ الْوَارِثِينَ

অর্থ ঃ "অতএব এই হল তাদের বাসস্থান, যা তাদের পরবর্তীতে আর আবাদ হয়নি। তবে সামান্য। আর আমিই তার উত্তরাধিকারী ছিলাম।"

সহস্র বছর পূর্বে হযরত লূত (আঃ) এই ভূখণ্ডেই অবিচলতার পর্বতরূপে তার উচ্ছৃংখল জাতির সংশোধনের চেষ্টা চালিয়েছেন, যারা মানবতার মূল্যকে আঁচড়ে বিকৃত করে নিজেদের ইতরামীতে মগ্ন ছিল। সেই সম্প্রদায় নিজেদের প্রকৃতিবিরুদ্ধ সমকামীতার কাজে সমগ্র বিশ্বে দূর্নাম কুড়িয়েছে। এমনকি ঘৃণিত সেই কাজের নামই সে জাতির সঙ্গে সম্পৃক্ত হয়ে যায়। কিন্তু পবিত্র কুরআন একথাও ব্যক্ত করেছে যে, সে জাতি ছিনতাইয়ের মত অপকর্মেও লিপ্ত ছিল এবং অপরিচিত কোন মুসাফির তাদের নিকট এসে পড়লে তার জানমাল এবং সম্মান সবই বিপদের সম্মুখীন হত। এমন মনে হয় যেন সেই জাতির এই চারিত্রিক অধঃপতনকে কেয়ামত পর্যন্ত আগত মানুষের জন্য এখানে ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য একটি রূপ দেওয়া হয়েছে, তাই এ অঞ্চলকে বিশ্বের সর্বনিম্ন অঞ্চল বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

এ স্থান অতি শিক্ষণীয় স্থান। কিন্তু এটা দেখে অন্তর প্রকম্পিত হয় যে, একে একটি সামুদ্রিক বিনোদন কেন্দ্র বানানো হয়েছে। শুধুমাত্র হোটেল রেস্তোরার বিষয় হলে এতটুকু মনোকষ্টের কারণ ছিল না। কিন্তু পর্যটনের দুঃসাহসিকতা এখানে সেই আবহাওয়া সৃষ্টি করেছে, যা ইউরোপের উপকূলসমূহের বিনোদন কেন্দ্রগুলোতে সচরাচর দেখা যায়।

বিশেষতঃ পাশ্চাত্যের পর্যটকদের ভীড় এবং তাদের সরকারের পক্ষ থেকে প্রাপ্ত অবারিত স্বাধীনতা একে নির্লজ্জতার কেন্দ্র বানিয়েছে। এ অবস্থা দেখে অন্তর খুবই ব্যথিত হলো যে জায়গা অশ্লীলতার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধ চেতনা বিনির্মাণের জন্য শিক্ষা গ্রহণের সর্বোত্তম বার্তা ছিল, আজ সেখানেই নির্লজ্জতার এমন প্রদর্শনী চলছে যে, ভদ্রতা সেখানে মুখ লুকিয়ে আত্মগোপন করে।

আমরা যখন এখানে পৌছি, তখন আসরের সময় হয়ে গেছে, বরং সময় সংকীর্ণ হতে চলেছে। খোঁজাখুঁজির পর একটি 'নিরাপদ স্থান' পেয়ে জামাতের সঙ্গে নামায আদায় করলাম। নামাযান্তে সমুদ্রতীরে গেলাম। দৃশ্যটি নিঃসন্দেহে অপরূপ। সমুদ্রের নীলাভ তরঙ্গের ওপারে ফিলিস্তীনের পাহাড় অত্যন্ত নয়নাভিরাম মনে হচ্ছিল। কিন্তু অন্তর বলছিল যে, এই জায়গা মনোরম দৃশ্যের সৌন্দর্য আস্বাদন করার চেয়ে অধিক ভীত হওয়ার, সন্ত্রস্ত হওয়ার এবং শিক্ষা গ্রহণের জন্য নির্দিষ্ট।

তবে এখানে দাঁড়ানোর আকর্ষণ অন্য কারণে ছিল। তা এই যে, মালিক আফজাল সাহেব বললেন, পশ্চিম দিগন্তে সমুদ্রের ওপারে ফিলিস্তীনের যেসব পাহাড় এখানে দাঁড়ালে দৃষ্টিগোচর হয়, সেগুলোর মধ্যেই বাইতুল মুকাদ্দাস অবস্থিত। যা এখান থেকে বার, পনের মাইলের অধিক দূরে নয়। এমনকি দিগন্ত পরিষ্কার থাকলে কোন কোন সময় সেসব পাহাড়ের মধ্যবর্তী কোন খালি জায়গা থেকে মসজিদে আকসার মিনারও দৃষ্টিগোচর হয়।

মসজিদে আকসার একটি ঝলক দূর থেকেই হোক না কেন, দেখার আগ্রহ অনেকক্ষণ পর্যন্ত আমাদেরকে এখানে দাঁড় করে রাখে। কিন্তু পশ্চিম দিকের পাহাড় হালকা কুয়াশার পরতে আচ্ছন্ন ছিল। এজন্য দিগন্তের অনেক পরিবর্তন সত্ত্বেও মিনার দৃষ্টিগোচর হলো না। মনে হচ্ছিল যেন এই পবিত্র মিনার নাজানি কতদিন ধরে মুসলিম উম্মাহকে তার সহযোগিতার জন্য আহ্বান করছে। কিন্তু কোন আইয়ুবীই যখন তার সেই আহবানে সাড়া দিল না। সে তখন অসন্তুষ্ট হয়ে আড়ালে চলে গেল। বর্তমানে আমাদের মত কথার গাজীদেরকে সে তার মুখমণ্ডলের একটি ঝলক দেখাতেও প্রস্তুত নয়।

এই কল্পনায় অন্তরে একটি আঘাত অনুভূত হল। নব্বই কোটি মুসলমানের এই মুসলিম বিশ্ব কি তাদের প্রথম কিবলা থেকে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিবে? শুধুমাত্র ক্রোধ ও বেদনার বিভিন্ন দফা পাশ করার দ্বারাই কি প্রথম কিবলার হক আদায় হয়ে যাবে? আমাদের মধ্য থেকে এখন কি আর কোন সালাহুদ্দীন আইয়ুবী উঠে দাঁড়াবে না? ইহুদী সাম্রাজ্যবাদের বিষধর অজগর কি আমাদেরকে এক এক করে এমনিভাবে গিলতে থাকবে? এসব প্রশ্নের উত্তরতো একটিই আর তা এই যে—

فضائے بدر پیدا کر، فرشتے تیری نصرت کو

اتر سکتے ہیں گردوں سے قطارِاندر قطاراب بھی

"বদরের পরিবেশ সৃষ্টি কর
তোমার সাহায্যের জন্য ঊর্ধ্বজগত থেকে
সারি সারি ফেরেশতা আজও অবতীর্ণ হতে পারে।"

কিন্তু এ রোগের কি চিকিৎসা আছে যে, শত্রুর চোয়ালের মধ্যে বসেও আমরা বদরের পরিবেশ সৃষ্টি করার পরিবর্তে 'শানযালিয়ের' পরিবেশ সৃষ্টি করার অভিলাষে বিভোর।

এই প্রশ্নোত্তরের ব্যথাতুর চিন্তায় আমি মগ্ন ছিলাম এমতাবস্থায় সম্মুখের পাহাড়ের পিছনে সূর্য অস্তমিত হয়ে গেল। মাগরিব নামায আমরা সেই সাগর সৈকতে আদায় করি। তারপর আম্মান ফেরার জন্য যাত্রা করি।

দীর্ঘপথ অতিক্রম করে যখন আমরা আম্মানের পর্বত শ্রেণীর নিকট পৌছি, তখন মুষলধারে বৃষ্টি শুরু হয়েছে। আমাদেরকে গাড়ী চালিয়ে একের পর এক কয়েকটি পাহাড় অতিক্রম করতে হবে। নিশ্ছিদ্র অন্ধকারে নিজের হাতও দেখা যাচ্ছিল না। গাড়ীর হেডলাইটের সম্মুখেও বৃষ্টির পর্দা বাধা সৃষ্টি করছিল। বন্ধুর পাহাড়ী পথে বৃষ্টির কারণে পথ দেখাও সমস্যা হচ্ছিল। আর কিছুটা দেখা গেলেও আমাদের মত ভিনদেশীদের জন্য তা বুঝে ওঠা অসম্ভব ছিল। এক জায়গায় তো আমার মনে হচ্ছিল যে, আমরা সম্পূর্ণ ভুল পথে চলছি। তবে আল্লাহর শোকর মালিক আফজাল সাহেব পথের চড়াই উৎরাই সম্পর্কে পূর্ণ অবগত ছিলেন। তাকে বাধা

দিয়ে নিজের বুদ্ধি ব্যবহার করা বোকামী ছিল। তাই নিশ্চুপ হয়ে রইলাম। তিনি অন্ধকার রাত্রি এবং প্রচণ্ড বৃষ্টির মধ্যেও নিশ্চিন্তে ও পূর্ণ আস্থার সঙ্গে পথ নির্দেশ করতে থাকেন, আর আতাউর রহমান সাহেব সেই বন্ধুর পথে অত্যন্ত সতর্কতা ও দক্ষতার সাথে উপযুক্ত গতিতে গাড়ী চালাতে থাকেন। ফলে আল্লাহর শোকর রাত্রি নয়টায় আমরা নিরাপদে আমাদের হোটেলে পৌছে যাই। এ থেকে শিক্ষা পেলাম যে, দিশারী চড়াই–উৎরাই সম্পর্কে ওয়াকিফ আর ড্রাইভার দক্ষ ও সতর্ক হলে গভীর অন্ধকার রাত্রিতে সংকটপূর্ণ পথও নিরাপদে অতিক্রম করা যায়। তবে শর্ত হলো মানুষকে এমতাবস্থায় নিজের বুদ্ধির দৌড় না দেখিয়ে নিজেকে এমন অভিজ্ঞ পথপ্রদর্শক এবং এমন ড্রাইভারের হাতে অর্পণ করতে হবে। বিষয়টি কত সহজ সরল ও স্পষ্ট। কিন্তু একথাই ফিকাহ এর আলেমগণ এবং তরীকতের মাশায়েখগণ বললে বর্তমান যুগে তাঁদেরকে অথর্ব অন্ধানুকরণকারী এবং ব্যক্তিপূজারী ইত্যাদি তিরস্কারে তীরবিদ্ধ করা হয়।

পরদিন সকালে আরো দুটি জায়গায় আমাদের যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। এক. 'আসহাবে কাহাফ' এর গুহায়, দুই, 'গাযওয়ায়ে মু'তার' যুদ্ধপ্রান্তরে। আমাদের ইচ্ছা ছিল এই দুই জায়গা দেখার পর সেখান থেকেই আমরা সোজা দিমাশ্ক অভিমুখে যাত্রা করব।

আসহাবে কাহাফের গুহায়

প্রায় সকাল আটটায় মালিক আফজাল সাহেবের পথ নির্দেশনায় আমরা প্রথমে আসহাবে কাহাফের গুহার দিকে যাত্রা করি। আসহাবে কাহাফের সেই গর্ত যেখানে তাঁরা তিনশ' বছরেরও অধিক সময় ঘুমিয়ে ছিলেন, কোথায় অবস্থিত এ ব্যাপারে গবেষক ও আলেমগণের মতানৈক্য রয়েছে। কেউ কেউ বলেছেন, সে গুহা তুরস্কের আফসুস শহরে। কেউ স্পেনের একটি গুহাকে আসহাবে কাহাফের গুহা আখ্যা দিয়েছেন। কেউ বলেছেন তা জর্দানে অবস্থিত। কারো মতে তা সিরিয়াতে অবস্থিত। আবার কারো ধারণা তা ইয়ামানে অবস্থিত। কিন্তু জর্দানের 'আশশারীয়াহ' পত্রিকার ভূতপূর্ব সম্পাদক বিশিষ্ট গবেষক মুহাম্মদ তাইসীর যিবয়ান সাহেব ১৯৭৬ সালে পাকিস্তানে আগমন করেন এবং হযরত ওয়ালিদ

সাহেব কুদ্দিসা সিররুহুর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য দারুল উলূমেও তাশরীফ আনেন, তখন তিনি অত্যন্ত আস্থা ও দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন যে, এই গর্ত সম্প্রতিকালেই আম্মানের সন্নিকটে একটি পাহাড়ে উদঘাটিত হয়েছে। তিনি উল্লেখ করেন যে, আমি এর গবেষণায় একটি প্রবন্ধও লিখেছি। তিনি সে সময় যেসব দলীল প্রমাণ ও নিদর্শনাবলী উল্লেখ করেন, তার ভিত্তিতে আসহাবে কাহাফের গুহা এটি হওয়াই অধিক যুক্তি যুক্ত মনে হয়।

তখন থেকেই এ জায়গাটি দেখার অভিলাষ আমার অন্তরে ছিল। আল্লাহ পাকের অপার অনুগ্রহে আজ দশ বছর পরে আমার সেই আশা পূর্ণ হল। তাইসির যিবয়ান সাহেব এখন আর বেঁচে নেই। কিন্তু তিনি তার গবেষণার ফলাফল বিশদ এক কিতাবে সংরক্ষণ করে রেখে গেছেন, যা দারুল ইতিসাম 'মাওকায়ে আসহাবে কাহাফ' নামে প্রকাশ করেছে।

'আসহাবে কাহাফ'এর ঘটনা পবিত্র কুরআনে বিবৃত হয়েছে। এই ঘটনার কারণেই পবিত্র কুরআনের একটি পূর্ণ সূরার নাম 'সূরাতুল কাহাফ' রয়েছে। আরবী ভাষায় কাহাফ গুহাকে বলা হয়। ঘটনাটি এই যে, প্রতিমাপূজারী এক বাদশাহর শাসনকালে কিছু তাজাপ্রাণ যুবক তাওহীদের উপর ঈমান আনে এবং শিরক ও মূর্তিপূজাকে পরিত্যাগ করে। মূর্তিপূজক বাদশাহ এবং তার সাঙ্গপাঙ্গরা তাঁদের উপর জুলুম অত্যাচার করতে শুরু করে। বিধায় তাঁরা তাঁদের বস্তি থেকে পলায়ন করে একটি গুহায় অবস্থান করেন। আল্লাহ তাআলা তাঁদের উপর গভীর নিদ্রা আরোপ করেন। ফলে তারা বহু বছর ঘুমাতে থাকেন। গুহার অবস্থানকেন্দ্র এরূপ ছিল যে, সূর্যের আলো এবং বায়ু প্রয়োজন মাফিক অন্দরে পৌছত। কিন্তু তার মধ্যে কোন সময় রৌদ্র প্রবেশ করত না। কয়েক বছর অতিবাহিত হওয়ার পর প্রতিমাপূজারী বাদশাহর শাসন বিলুপ্ত হয়ে যায়। এবং তার স্থলে তাওহীদবাদী বিশুদ্ধ আকীদার অধিকারী একজন নেককার বাদশাহ ক্ষমতাসীন হন। তাঁর শাসনকালে এ সকল যুবক নিদ্রা থেকে জেগে ওঠেন। তাঁরা ক্ষুধার্ত ছিলেন, তাই তাঁদের এক সঙ্গীকে তাঁদের সঙ্গের মুদ্রা থেকে কিছু মুদ্রা দিয়ে পাঠান এবং গোপনে হালাল খাবার ক্রয় করে আনতে তাগীদ করেন। তাঁরা মনে করছিলেন

যে, এখনও সেই প্রতিমাপূজারী বাদশাহর শাসন চলছে। তাই তাঁদের আশঙ্কা হচ্ছিল যে, যদি বাদশাহর লোকেরা কোনভাবে তাদের অবস্থানের কথা জেনে যায়, তাহলে কল্পনাতীত জুলুম নির্যাতনের শিকার হতে হবে। সুতরাং সেই ব্যক্তি লুকিয়ে লুকিয়ে জনবসতি এলাকায় চলে যায় এবং একজন রুটি বিক্রেতার দোকান থেকে খাবার ক্রয় করে। সে যখন দোকানদারের নিকট মুদ্রা হস্তান্তর করল, তখন দোকানদার অনেক প্রাচীনকালের মুদ্রা দেখতে পেয়ে তাঁদের গোপন অবস্থানের কথা জেনে যায়। পূর্বের শাসন বদলে যাওয়ার বিষয়টি জানতে পেরে তাঁরাও নিশ্চিত হন। বিষয়টি এক পর্যায়ে তৎকালীন শাসক পর্যন্ত পৌঁছে যায় এবং এই ব্যক্তিও তাঁর সঙ্গীদেরকে নতুন অবস্থা সম্পর্কে অবহিত করে।

পবিত্র কুরআন সংক্ষিপ্তাকারে উল্লেখিত ঘটনা ব্যক্ত করার পর একথাও ইরশাদ করেছে যে, সে যুগের লোকেরা আল্লাহ তাআলার এই প্রিয় বান্দাদের মর্যাদা প্রদর্শন করে সেই গুহার উপর একটি মসজিদ নির্মাণের সংকল্প প্রকাশ করে।

পবিত্র কুরআন তার সচরাচর বর্ণনা পদ্ধতি অনুযায়ী এই ঘটনার ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেনি। তাই এটি কোন যুগের এবং কোন জায়গার ঘটনা পবিত্র কুরআনে তা উল্লেখ হয়নি। সুতরাং ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে তাফসীরবিদ ও ইতিহাসবিদগণ এ বিষয়ে বিভিন্ন মতামত প্রকাশ করেছেন। বেশীর ভাগ গবেষকের মত এই যে, এ ঘটনা হযরত ঈসা (আঃ)এর আকাশ গমনের অল্পদিন পরেই অর্থাৎ প্রথম থেকে তৃতীয় খৃষ্ট শতাব্দী সময় কালের মধ্যে ঘটেছে। সে সময় এ অঞ্চলে নীবতী মূর্তিপূজক বাদশাহর শাসন চালু ছিল। কিন্তু ক্রমান্বয়ে ফিলিস্তীনে আত্মপ্রকাশকারী খৃষ্টধর্মের প্রভাব এখান পর্যন্ত পৌঁছতে থাকে। যার ফলে এই তরুণেরা সে ধর্মে দীক্ষিত হন। তারপর যে সময় সৌভাগ্যবান এই ব্যক্তিগণ গুহায় নিদ্রামগ্ন ছিলেন, সে সময় ক্রমান্বয়ে খৃষ্টধর্মের অনুসারীরা এ অঞ্চলকে নিবতী শাসকদের থেকে মুক্ত করে নিজেদের শাসন প্রতিষ্ঠায় সফল হয়। এবং এখানকার বাসিন্দারাও খৃষ্টধর্ম গ্রহণ করে।

পরবর্তীতে সকল ব্যক্তিবর্গ জাগ্রত হয়ে পরিবর্তিত অবস্থা সম্পর্কে

অবগত হওয়ার পর যদিও সত্যধর্মের বিস্তারে আনন্দিত হন কিন্তু তাঁরা দুনিয়ার হাঙ্গামা থেকে দূরে এই গুহাতে বাকী জীবন অতিবাহিত করাই পছন্দ করেন। তাই লোকেরা যখন তাঁদেরকে শহরে আসার জন্য পীড়াপীড়ি করে, তখন তাঁরা এতে উদ্বুদ্ধ হননি এবং তাঁদের জীবনের অবশিষ্ট সময় সেই গুহাতেই কাটিয়ে দেন। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, তৎকালীন বাদশাহ তাঁদের অবস্থা অবগত হয়ে যখন তাঁদের সাথে সাক্ষাতের জন্য গুহায় পৌঁছেন, তখন তাঁদের মৃত্যু হয়েছিল। কিন্তু অন্যান্য বর্ণনা তাঁদের মৃত্যুর ব্যাপারে নির্বাক দেখা যায়।

খৃষ্টীয় উৎসসমূহেও সামান্য পার্থক্য সহকারে এই ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। বলা হয় যে, সর্বপ্রথম এই ঘটনার বিস্তারিত আলোচনা ৫২১ হিজরীতে সারগের (ইরাকের) এক গণক যার নাম ইয়াকুব (বা জেমস) বিস্তারিত প্রবন্ধ লিখেন। প্রবন্ধটি সুরিয়ানী ভাষায় ছিল। পরে তা গ্রীক এবং ল্যাটিন ভাষায় অনূদিত হয়। তার বর্ণনামতে ঘটনাটি ২৫০ খৃষ্টাব্দে এশিয়া মাইনরের আফসুস নগরীতে সংঘটিত হয়। তরুণরা সংখ্যায় সাতজন ছিলেন এবং তাঁরা আল্লাহ পাকের নিপুণ ক্ষমতার বার্তা দুনিয়াবাসীকে শুনিয়ে সেই গুহাতেই পুনরায় ঘুমিয়ে পড়েন।

ইয়াকুব সারুগী তাদের সম্পর্কে 'পুনর্বার ঘুমানোর' শব্দ প্রয়োগ করায় অনেকের এরূপ বিশ্বাসও রয়েছে যে, আসহাবে কাহাফ এখনও জীবিত রয়েছেন এবং কিয়ামতের সন্নিকটে তাঁরা পুনর্বার জাগ্রত হবেন।

খৃষ্টীয় উৎসসমূহে প্রায় নিশ্চিতভাবে বর্ণিত হয়েছে যে, এই ঘটনা তুরস্কের আফসুস নগরীর নিকটবর্তী কোথাও ঘটে (যার ইসলামী নাম তরসুস) এবং সেখানকারই একটি গুহা সম্পর্কে বলা হয় যে, এটি আসহাবে কাহাফের গুহা। সম্ভবতঃ এসব খৃষ্টীয় বর্ণনাসমূহ দ্বারা প্রভাবান্বিত হয়ে অনেক মুসলিম তাফসীর বিশারদ এবং ঐতিহাসিকও আসহাবে কাহাফের অবস্থানস্থল আফসুস নগরীতেই ব্যক্ত করেছেন। তাছাড়া হযরত আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাযিঃ) হতে ইবনে জারীর একটি বর্ণনা উদ্ধৃত করেন তাতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) বলেন ঃ আসহাবে কাহাফের গুহা আয়লা (আকাবা উপসাগর)এর নিকটে (অর্থাৎ জর্দানে) অবস্থিত। এই বর্ণনা এবং অন্যান্য অনেক লক্ষণের উপর ভিত্তি

করে শেষ যুগের অনেক গবেষক তাঁদের সেই গুহা জর্দানে হওয়ার মতটিকেই প্রাধান্য দিয়েছেন। হযরত মাওলানা হিফযুর রহমান সাহেব সিয়ুহারভী (রহঃ) কসাসুল কুরআনে এ বিষয়ে বিশদ আলোচনা করেছেন এবং এতদসংক্রান্ত ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক দলীল প্রমাণের আলোকে উপরোক্ত মতকেই সঠিক সাব্যস্ত করেছেন। হযরত মাওলানা সাইয়্যেদ সুলায়মান নদভী (রহঃ) 'আরযুল কুরআন' নামক গ্রন্থে জর্দানের প্রাচীন শহর 'পেট্রা'কে 'রকীম' সাব্যস্ত করেছেন। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব (রহঃ)ও তাফসীরে মাআরিফুল কুরআনে বিস্তারিত আলোচনা করার পর সেই গুহা জর্দানে হওয়ার দিকেই তাঁর মত ব্যক্ত করেছেন। মাওলানা আবুল কালাম আজাদ মরহুমের মতও এটিই ছিল।

এ সকল হযরতের গবেষণার সার এই যে, জর্দানের প্রসিদ্ধ ও ঐতিহাসিক নগরী 'পেট্রা'র আসল নাম রকীম ছিল। রোমান সরকার তা পরিবর্তন করে পেট্রা নামকরণ করে এবং এই গুহা তারই নিকটবর্তী কোথাও অবস্থিত।

১৯৫৩ সালে জর্দানের বিশিষ্ট গবেষক যিবয়ান সাহেব কোন এক মাধ্যমে অবগত হন যে, আম্মানের নিকটবর্তী একটি পাহাড়ে এমন একটি গুহা রয়েছে, যার মধ্যে কিছু কবর এবং মৃতের কঙ্কাল রয়েছে এবং সেই গুহার উপরে একটি মসজিদও নির্মিত হয়েছে। তখন তিনি তাঁর এক সঙ্গীসহ সেই গুহার খোঁজে রওনা হন। জায়গাটি যেহেতু চলাচলের সাধারণ রাস্তা থেকে দূরে ছিল। তাই তাঁরা কয়েক কিলোমিটার বন্ধুর পথ অতিক্রম করে গুহার মুখে পৌছতে সক্ষম হন। তাইসির যিবয়ান সাহেবের ভাষায় সেখানে পৌছার ঘটনা নিম্নে প্রদত্ত হল ঃ

"আমরা একটি অন্ধকার গুহার মুখে দাঁড়িয়ে ছিলাম। গুহাটি বহুদূরে এক লতাপাতাহীন পাহাড়ে অবস্থিত ছিল। গুহাতে এত গাঢ় অন্ধকার ছিল যে, ভিতরে প্রবেশ করা আমাদের জন্য দুস্কর হয়ে পড়ে। একজন রাখাল আমাদেরকে বলল ঃ গুহার অভ্যন্তরে কয়েকটি কবর রয়েছে এবং তার মধ্যে পুরাতন হাড্ডি পড়ে আছে। গুহার মুখ দক্ষিণ দিকে। তার উভয় দিকে দুটি খুঁটি আছে যা পাথর কেটে বানানো হয়েছে। অকস্মাৎ

সেই খুঁটিদ্বয়ে অঙ্কিত চিত্রে আমার দৃষ্টি পড়ে। তখন তাতে বাইযেনটাইনের চিত্র দেখতে পাই। গুহাটি চতুর্দিক থেকে পাথরের স্তূপ এবং ময়লা দ্বারা ঢাকা। এখান থেকে আনুমানিক ১০০ মিটার দূরে রাজীব নামের একটি বস্তি আছে।”

তাইসির যিবয়ান সাহেব তাঁর গবেষণা অব্যাহত রাখেন। তিনি এদিকে প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তরের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। পরিশেষে রফিক রজ্জানী নামক একজন প্রত্নতত্ত্ববিশারদ অত্যন্ত দক্ষতা সহকারে গবেষণা চালিয়ে এটিই আসহাবে কাহাফের গুহা বলে মতামত প্রকাশ করেন। সুতরাং ১৯৬১ সালে এ জায়গায় খনন কার্য শুরু হয়। তখন এই মতের সপক্ষে অনেক দলীল প্রমাণ ও লক্ষণাদি পাওয়া যায়। যার কয়েকটি নিম্নরূপ—

১. গুহাটির মুখ দক্ষিণ দিকে। ফলে পবিত্র কুরআনের নিম্নোক্ত আয়াত এই গুহার উপর পরিপূর্ণরূপে ফলে—

وَالشَّمْسَ إِذَا طَلَعَتْ تَزَاوَرُ عَنْ كَهْفِهِمْ ذَاتَ الْيَمِينِ وَإِذَا غَرَبَتْ تَقْرِضُهُمْ ذَاتَ الشِّمَالِ وَهُمْ فِي فَجْوَةٍ مِّنْهُ -

“আর সূর্য যখন উদয় হত তখন তাঁদের গুহা থেকে ডান দিকে ঝুঁকে অতিক্রম করত। আর যখন অস্ত যেত তখন তার বামদিকে বেঁকে অতিক্রম করত। আর এরা সেই গুহার প্রশস্ত অংশে ছিল।” (সূরা কাহফ)

এই গুহার অবস্থাও এই যে, কোন সময় এর ভিতরে রৌদ্র প্রবেশ করে না। বরং সূর্য উদয় ও অস্তকালে তার ডান এবং বাম দিক হয়ে অতিক্রম করে এবং গুহার অভ্যন্তরে প্রশস্ত একটি খালি জায়গাও রয়েছে, যার মধ্যে অনায়াসে আলো বাতাস পৌঁছে।

২. পবিত্র কুরআন এ কথাও উল্লেখ করেছে যে, সেই জনপদের অধিবাসীরা ঐ গুহার উপরে মসজিদ নির্মাণ করার ইচ্ছা করেছিল। সুতরাং এই গুহার ঠিক উপরে খনন করে ধ্বংসাবশেষ অপসারণের পর একটি মসজিদও বের হয়। যা প্রাচীন রোমীয় ধাঁচে পাথরের তৈরী। প্রত্নতত্ত্ববিশারদগণের অভিমতও এই যে, এটি পাথর দ্বারা নির্মাণ করা হয়। তাদের বক্তব্য এই যে, প্রথম দিকে এটি বাইজেন্টাইন পদ্ধতির

একটি উপাসনালয় ছিল। আবদুল মালেক বিন মারওয়ানের শাসনকালে তা মসজিদে পরিণত করা হয়।

৩. বর্তমান যুগের অধিকাংশ গবেষকের বক্তব্য এই যে, যেই মুশরিক বাদশাহর জুলুম অত্যাচারে অতিষ্ঠ হয়ে 'আসহাবে কাহাফ' গুহায় আশ্রয় নিয়েছিল তার নাম ছিল ট্রাজান। সে ৯৮ খৃষ্টাব্দ থেকে ১১৭ খৃষ্টাব্দ পর্যন্ত সেখানকার শাসক ছিল। মূর্তিপূজার বিরোধীদের উপর তার অকথ্য নির্যাতন চালানোর কথাও প্রসিদ্ধ আছে। ইতিহাসে একথাও প্রমাণিত আছে যে, ট্রাজান একশ' ছয় খৃষ্টাব্দে জর্দানের পূর্বাঞ্চল জয় করে এবং সে-ই পূর্বালোচিত আম্মানের ষ্টেডিয়াম নির্মাণ করে এবং যেই বাদশাহর শাসনকালে আসহাবে কাহাফ জাগ্রত হন, আধুনিক গবেষকগণ তার নাম থিওডসিস ব্যক্ত করেছেন। তার শাসনকাল পঞ্চম শতাব্দীর সূচনাতে অতিবাহিত হয়।

অপরদিকে এই নব আবিস্কৃত গুহার ভিতর যেই মুদ্রা পাওয়া যায়, তার কিছু ছিল ট্রাজানের শাসনকালের। যার দ্বারা উপরোক্ত মতামত অত্যন্ত শক্তিশালী হয় যে, এটিই আসহাবে কাহাফের গুহা।

৪. পবিত্র কুরআন আসহাবে কাহাফকে আসহাবুল কাহ্‌ফি অর রকীমি (গুহা এবং রকীমওয়ালাগণ) বলেছে। রকীম কি জিনিস? এর ব্যাখ্যায় বিভিন্ন মতামত বর্ণনা করা হয়। কিন্তু বেশীর ভাগ গবেষকের ধারণা এই যে, রকীম ঐ বস্তির নাম ছিল, যেখানে এরা প্রথমে বাস করতেন। যে জায়গায় এই গুহা অবস্থিত সেখান থেকে সর্বমোট ১০০ মিটার দূরত্বের একটি বস্তিকে রজীব বলা হয়। রফিক আদ দাজ্জানী সাহেবের ধারণা এই যে, এটি রকীম শব্দের বিকৃত রূপ। কেননা এখানকার বেদুঈনরা সাধারণতঃ ক্বফকে জীম এবং মীমকে বা দ্বারা পরিবর্তন করে কথা বলে। সুতরাং এখন জর্দান সরকার সেই বস্তির নাম রাষ্ট্রীয়ভাবে রকীম নির্ধারণ করে দিয়েছেন। কোন কোন প্রাচীন ভূগোলবিদও রকীম নামক বস্তিকে আম্মানের নিকটে বলে উল্লেখ করেছেন। সুতরাং প্রখ্যাত ভূগোল বিশারদ আবু আবদুল্লাহ আল বাশারী আল মুকাদ্দাসী তদীয় গ্রন্থ 'আহসানুত তাকাসীম ফি মারিফাতিল আকালিম'-এ লেখেন—

"রকীম পূর্ব জর্দানের আম্মানের নিকটবর্তী একটি শহর। যেখানে

একটি গুহাও আবিস্কৃত হয়েছে। সেখানে কয়েকটি মানব কঙ্কালও রয়েছে, যা খুব বেশী নষ্ট হয়নি।"

এছাড়া আল্লামা ইয়াকুত হামভীও রকীমের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে একটি উক্তি উদ্ধৃত করেছেন—

"দেমাস্কের শহরতলীতে বলকা নামক যে আরবীয় ভূখণ্ড আছে, সেখানে আম্মান শহরের অদূরে একটি জায়গা আছে, যে জায়গা সম্পর্কে সেখানকার অধিবাসীদের ধারণা এই যে, সেটিই কাহাফ এবং রকীম।"

৫. তাইসীর যিবয়ান সাহেব এমন কিছু বর্ণনা নকল করেছেন, যেগুলো দ্বারা জানা যায় যে, পূর্ব যুগের মুসলমানেরা এ অঞ্চলেরই কোন গুহাকে আসহাবে কাহাফের গুহা মনে করতেন। হযরত উবাদা বিন সামিত (রাযিঃ) সম্পর্কে বর্ণিত আছে যে, হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাঁকে রোম সম্রাটের নিকট দূত বানিয়ে পাঠালে পথিমধ্যে তিনি সিরিয়া ও হেজাজের পথে জাবালুর রকীম নামক একটি পাহাড় অতিক্রম করেন। তাতে একটি গুহাও ছিল। সেই গুহার মধ্যে কয়েকটি কঙ্কাল ছিল এবং তা খুব বেশী নষ্টও ছিল না। এছাড়া তাফসীরে কুরতুবীতে হযরত ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) সম্পর্কেও বর্ণিত আছে যে, তিনি এই গুহা অতিক্রম করেন এবং একে আসহাবে কাহাফের গুহা সাব্যস্ত করেন। 'ফুতুহুশ শাম' গ্রন্থে ওয়াকেদী (রহঃ)ও হযরত সাঈদ বিন আমের (রাযিঃ)এর একটি দীর্ঘ ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন যে, তিনি সিরিয়া অভিমুখে জিহাদে যাত্রা করেন এবং পথ ভুলে বিভ্রান্ত অবস্থায় চলতে চলতে জাবালুর রকীম এর নিকট পৌছেন এবং তা দেখে চিনে ফেলেন। তখন তিনি তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেন ঃ এটি আসহাবে কাহাফের গুহা। সুতরাং তাঁরা সেখানে নামায পড়ে আম্মান শহরে প্রবেশ করেন।

যাই হোক এত প্রাচীন একটি ঘটনার অবস্থানকেন্দ্র সম্পর্কে চূড়ান্তভাবে একশ' ভাগ নিশ্চয়তার সাথে কিছু বলাতো মুশকিল। তবে এতে সন্দেহ নেই যে, এ পর্যন্ত যতগুলো জায়গা সম্পর্কে আসহাবে কাহাফের জায়গা বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে, তার মধ্যে এই গুহার সপক্ষে যত বেশী প্রমাণ ও লক্ষণ বিদ্যমান অন্য কোন গুহার সপক্ষে এত

লক্ষণ বিদ্যমান নেই। তাইসীর যিবয়ান সাহেব তদীয় গ্রন্থে আফসুসের গুহার সঙ্গে এই গুহার তুলনামূলক আলোচনাও করেছেন। তা থেকেও এ কথাই প্রমাণিত হয়।

এই গুহাটি আম্মান শহর থেকে ৭ কিলোমিটার দক্ষিণে অবস্থিত। এবং জর্দানের কেন্দ্রীয় মহাসড়ক, যা আকাবা থেকে আম্মান পর্যন্ত গিয়েছে, সে সড়ক থেকে এর দূরত্ব ৩ কিলোমিটার। প্রায় সকাল নয়টায় আমরা এখানে পৌঁছি। এখন গাড়ী চলার জন্য পাহাড়ের উপর পর্যন্ত পথ বানানো হয়েছে। গাড়ী থেকে নেমে অল্প উপরে উঠলে আঙ্গিনার মত একটি প্রশস্ত জায়গা রয়েছে। তার মধ্যে প্রাচীন নির্মাণ পদ্ধতির কয়েকটি স্তম্ভসহ আরো কিছু জিনিস রয়েছে। এ আঙ্গিনা অতিক্রম করার পর গুহার মুখ। গুহার মুখে মাটিতে বেশ চওড়া একটি পাথর নির্মিত চৌকাঠের মত রয়েছে। সেখান থেকে গুহার ভিতরে নামার জন্য আনুমানিক দুই সিঁড়ি নীচে যেতে হয়। এখানে এসে গুহাটি তিন অংশে বিভক্ত হয়েছে। এক অংশ মুখ থেকে সোজা উত্তর পর্যন্ত চলে গেছে, দ্বিতীয়টি ডান দিকে পূর্বমূখী মোড় নিয়েছে এবং তৃতীয়টি বামদিকে পশ্চিমমূখী। পূর্ব ও পশ্চিমের অংশে বাক্সের মত আটটি কবর রয়েছে। পূর্বাংশের একটি কবরে ছোট একটি ছিদ্র রয়েছে। সেই ছিদ্রে উঁকি দিয়ে দেখলে একটি মানব কঙ্কাল স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়। অন্ধকার থাকলে গুহার খাদেম মোমবাতি জ্বেলে ভিতরের দৃশ্য দেখিয়ে দেয়।

কিন্তু গুহার যে অংশ দক্ষিণ থেকে সোজা উত্তর দিকে গেছে, তা প্রায় সমতল এবং এ জায়গা সম্পর্কে তাইসীর যিবয়ান সাহেবের ধারণা এই যে, এটিই সেই 'ফাজওয়া'। পবিত্র কুরআনে যার উল্লেখ হয়েছে। রফিক আদ্দাজ্জানী বলেন, ১৯৬১ সালে যখন গুহার পরিচ্ছন্নতার এবং খননের কাজ শুরু হয়, তখন গুহার মধ্যবর্তী এ স্থানে একটি প্রাণীর চোয়াল পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়। তাতে চোখা একটি দাঁত এবং চারটি অংশ রক্ষিত ছিল। তাইসীর যিবয়ান সাহেবের ধারণা এই যে, এটি আসহাবে কাহাফের কুকুরের চোয়াল ছিল। তাছাড়া এখানে সে সময় রুমী, ইসলামী এবং ওসমানী আমলের অনেক মুদ্রা, পাত্র, কড়ির হার, পিতলের চুড়ি, এবং আংটিও পড়ে থাকা অবস্থায় পাওয়া যায়। এখন এসব বস্তু একটি

আলমারীতে একত্র করে গুহার উত্তর দেওয়ালে সংরক্ষণ করে রাখা হয়েছে। আমরাও সেগুলো দেখলাম।

গুহার পূর্বের অংশে উপরমুখী ছোট একটি সুড়ঙ্গ রয়েছে। সুড়ঙ্গটি ধোঁয়া নিস্কাশনী চিমনীর আকৃতির। সুড়ঙ্গটি গুহার ছাদে নির্মিত মসজিদে গিয়ে শেষ হয়েছে। যখন এই গুহা আবিস্কার হয় তখন এই সুড়ঙ্গের উপরের মুখে একটি পাথর রক্ষিত ছিল। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর সেনাবাহিনীর উসামা বিন মুনকিয নামক একজন জেনারেল তদীয় গ্রন্থ আল ইতিবারেও উল্লেখ করেছেন যে, আমি ত্রিশজন অশ্বারোহী সমভিব্যাহারে সেই গুহায় যাই এবং সেখানে নামায পড়ি। সেখানে একটি সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ ছিল। তবে তাতে প্রবেশ করিনি। তাইসীর যিবয়ান সাহেবের ধারণা মতে এটিই সেই সংকীর্ণ সুড়ঙ্গ পথ।

গুহা পরিস্কার করা হলে তার প্রাচীরে কুফা এবং গ্রীক হস্তলিপিতে কিছু কথা লেখা দেখতে পাওয়া যায়। বর্তমানে তা আর পাঠ করা যায় না। গুহা থেকে বের হওয়ার পর সম্মুখের আঙ্গিনায় একটি গোল বৃত্ত দেখা যায়। খাদেম বলল, গুহা আবিস্কারের সময় এখানে যাইতুন বৃক্ষের একটি ডাল বের হয়। রফিক আদ্দাজ্জানী সাহেব লিখেছেন যে, যাইতুনের এই বৃক্ষ 'বাদউবী'দের যুগের। তার নিকটে ছাদবিশিষ্ট একটি কবরও ছিল। যখন আমরা প্রথম প্রথম এখানে খননকাজ ও পরিস্কার করার কাজ শুরু করি, তখন আশাপাশের বয়ঃবৃদ্ধ লোকেরা বলে যে, যাইতুনের এই বৃক্ষ বিশ বছর পূর্ব পর্যন্ত সজীব ছিল এবং আমরা তার ফলও খেয়েছি।

গুহার ঠিক উপরে প্রাচীন একটি মসজিদের প্রাচীরসমূহ এবং মেহরাব মাটি থেকে কয়েক ফুট উপরে দেখতে পাওয়া যায়। শুরুতে যখন তাইসীর যিবয়ান এবং রফিক আদ্দাজ্জানী সাহেব এখানে পৌছেন সেসময় এ মসজিদ দেখা যেত না। খনন এবং পরিস্কার করার পর এই মসজিদ বের হয়ে আসে। মসজিদটি দশ মিটার লম্বা এবং দশ মিটার চওড়া। খনন কাজ চলাকালে তার মধ্যে রোমান ধাচে নির্মিত চারটি গোল স্তম্ভ বের হয়। খননের সময় এখান থেকে রোম সম্রাট জাষ্টিনের যুগের (৫১৭ থেকে ৫২৭) কিছু পিতলের মুদ্রাও বের হয়। দেড় মিটার সমান ছোট

একটি কক্ষও বের হয়। সম্ভবতঃ এর ছাদ আযান দেওয়ার কাজে ব্যবহার করা হত। এর নিকটেই মাটির তৈরী কিছু বদনা পাওয়া যায়, যেগুলো উযূ করার কাজে ব্যবহার হত। এখান থেকেই একটি লিখিত ফলকও বের হয়, যার লেখা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, আহমাদ বিন তুলুন এর পুত্র খামারবিয়ার যুগে (৮৯৫ খৃঃ) মসজিদ মেরামত করা হয়।

উপরোক্ত আলোচনার সমষ্টি থেকে এ বিষয়ের পণ্ডিতগণ যে ফলাফল উদঘাটন করেন তার সারকথা এই যে, এখানে প্রথমে রোমীয়রা একটি উপাসনালয় নির্মাণ করে। ইসলামের যুগে (সম্ভবতঃ আবদুল মালিক বিন মারওয়ানের শাসনকালে) তাকে মসজিদে পরিণত করা হয়। তবে মুসলমানগণ এর দৈর্ঘ্য প্রস্থে বৃদ্ধি করেননি।

বর্তমানে জর্দানের প্রত্নতত্ত্ব অধিদপ্তর এবং ওয়াকফ বিষয়ক অধিদপ্তর এই গুহার সংরক্ষণ এবং পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদি বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি আরোপ করেছে। এর অদূরে নতুন একটি মসজিদও নির্মাণ করেছে। ভ্রমণকারীদের সুবিধার্থে রাস্তা সহজ করে দিয়েছে এবং গুহার মধ্যে বিভিন্ন লিখিত ফলক লাগিয়ে দিয়েছে।

যাই হোক কুরআনে উল্লেখিত গুরুত্বপূর্ণ এই বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট জায়গা দেখা যা বর্তমান যুগে বিশেষভাবে আবিস্কৃত হয়েছে জীবনের বিশেষ স্মরণীয় অভিজ্ঞতার অন্যতম ছিল। দিব্য দৃষ্টিসম্পন্ন লোকদের জন্য আসহাবে কাহাফের ঘটনায় অসংখ্য শিক্ষণীয় দিক রয়েছে। শ্রদ্ধেয় মুরুব্বী হযরত মাওলানা সাইয়্যিদ আবুল হাসান আলী নদভী এ ঘটনারই শিক্ষা ও আবেদন সম্পর্কে 'মা'রাকাতুল ঈমান ওয়াল মদ্দিয়াত' নামক একটি স্বতন্ত্র গ্রন্থ রচনা করেছেন, যা এ ঘটনার ঐতিহাসিক ও ভৌগলিক গবেষণা থেকে অনেক বেশী গুরুত্বপূর্ণ এবং পবিত্র কুরআনে এই ঘটনার উল্লেখ প্রকৃতপক্ষে সেসব শিক্ষার দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্যই হয়েছে।

মুতার সফর

আসহাবে কাহাফের গুহা দেখার পর আমাদের মুতা যাওয়ার এবং সেখান থেকে সোজা দিমাশক যাওয়ার ইচ্ছা ছিল। মালিক আফজাল সাহেব আমাদেরকে সোজা মুতাগামী সড়কে পৌঁছে দিয়ে তিনি আম্মানেই

থেকে যান এবং তিনি বললেন যে, যদিও আমি এ পথে কখনো মুতা যাইনি কিন্তু আমার জানা আছে যে, এ সড়ক সোজা 'মুতা' চলে গেছে। আর মুতা এখান থেকে আনুমানিক ৫০/৬০ কিলোমিটার দূরে হবে।

এই অনুমানের উপর ভরসা করে আমরা সেই সড়ক ধরে চলতে আরম্ভ করি। ধারণা ছিল যে, দ্বিপ্রহর বা ত্রিপ্রহরের দিকে আমরা সেখানকার কাজ শেষ করে দিমাশক অভিমুখে রওনা করব। কিন্তু সেই সড়কে চলতে আরম্ভ করলে সফর দীর্ঘ হতে থাকে। পথিমধ্যে অসংখ্য গ্রাম এবং ছোট ছোট শহর অতিক্রম করতে থাকি। অনেক দূর যাওয়ার পর আমরা এলাকার লোকদের থেকে পথ সম্পর্কে নিশ্চিত হতে চাইলে তারা জানালো যে, বাস্তবিকই এই সড়ক মুতা যাচ্ছে। কিন্তু এর দূরত্ব সম্পর্কে কারো সঠিক ধারণা ছিল না। কারো নিকট মুতা এবং তার নিকটবর্তী গ্রাম 'মাযার' সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে সে বলত 'দুগ্‌রা' অর্থাৎ সোজা চলতে থাকো।

একজন তো তার সাথে এ শব্দও সংযোজন করল ঃ

لا هيك ولا هيك

আমি জীনদের ভাষার ন্যায় এই দুর্বোধ্য ভাষা মোটেও বুঝতে পারলাম না। ক্বারী বশীর সাহেব ব্যাখ্যা করে বুঝালেন যে,

لا هكذا ولا هكذا

এর অর্থ 'না এদিকে, না ওদিকে, একেবারে সোজা চলতে থাকুন।'

সুতরাং আমরা সোজা চলতে থাকি। কিন্তু কিছুক্ষণ পর এই সড়ক জনবসতিপূর্ণ সমতল অঞ্চল থেকে সরে গিয়ে পাহাড়ী অঞ্চলে প্রবেশ করতে থাকে। দেখতে দেখতে অনেক উঁচু এক পাহাড়ে আরোহণ করতে শুরু করে। এই পাহাড়ী পথ অত্যন্ত পেঁচানো এবং বিপদসংকুল। জায়গায় জায়গায় এমন অন্ধ মোড় সম্মুখে চলে আসত যে, কয়েক গজ পরেই সড়ক অদৃশ্য হয়ে যেত এবং প্রত্যেক মোড়ের পর গাড়ী আরো উঁচুতে আরোহণ করত। এমনিভাবে যখন আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে পাহাড়ের চড়াই উৎরাই খতম হলো, তখন এর চেয়েও উঁচু আর একটি

আকাশচুম্বী পাহাড় সামনে এলো। আমরা লক্ষ্য করে দেখতে পেলাম, দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী একটি নদী অতিক্রম করে সড়কটি দ্বিতীয় পাহাড়ে আরোহণ করেছে। পরবর্তী এই চড়াইটি পূর্বেরটার চেয়েও অধিক বিপদসংকুল। উপরে উঠে অনুমান হলো যে, সম্ভবতঃ আমরা কয়েক হাজার ফুট উপরে চলে এসেছি। একাধারে পেঁচানো চড়াই অতিক্রম করার পর গাড়ী চালাতে আতাউর রহমান সাহেবের মাথায় চক্করের মত লাগছিল। তাই চূড়ায় আরোহণ করে আমরা কিছু সময়ের জন্য সামনে চলা বন্ধ রাখি। পাহাড়ের উভয় দিকে সুদূর বিস্তৃত উপত্যকাসমূহ এবং তার মাঝের প্রবাহিত ঝর্ণাসমূহের চিত্তাকর্ষক দৃশ্য আমাদের চোখের সামনে বিরাজ করছিল। প্রান্তরে বিচরণকারী পশুগুলো পিঁপড়ার সারির মত দেখাচ্ছিল। এখানে ঠাণ্ডাও বেশী ছিল। কিন্তু উন্মুক্ত রোদ এই শীতলতাকে অত্যন্ত মজাদার বানিয়ে দেয়।

নয়নাভিরাম এই দৃশ্য এবং সম্মোহণকারী এই পরিবেশে মোহিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই চিন্তাও লেগেছিল যে, নাজানি মুতা এখনও কত দূরে! অপরিচিত এই পথে নাজানি আরো কত ঘাঁটি সম্মুখে রয়েছে এবং সেখান থেকে আমরা কখন যে দিমাশ্‌ক যাত্রা করতে পারব? এ অঞ্চলে সন্ধ্যা নেমে এলে রাত্রিবেলায় অসময়ে দিমাশ্‌ক সফর করা যথার্থ হবে কিনা? এসব প্রশ্নের সাথে সাথে চিন্তার গতি প্রায় ১৪০০ বছর পিছে ফিরে যায়। তিনদিন ধরে আমরা যেই রুক্ষ মরুভূমি, বৃক্ষশূন্য প্রান্তরসমূহ এবং গগনচুম্বী পাহাড়সমূহ প্রত্যক্ষ করতে করতে আসছি, এর সবগুলো ইসলামের সেই মুজাহিদদের পথ-মঞ্জিল ছিল, যাঁরা অজ্ঞাত এইপথে ঈমানের মশাল প্রজ্জ্বলিত করার উদ্দেশ্যে বের হয়েছিলেন। তাঁদের জন্য এই পথ শুধু অপরিচিতই ছিল না, বরং প্রত্যেক মোড়ে মোড়ে এ শঙ্কাও ছিল যে, এটি শত্রুপক্ষের কোন ঘাঁটি না হয়। কিন্তু তাঁদের দৃঢ়তা ও অবিচলতাকে কোন পাহাড় হেলাতে সক্ষম হয়নি। পথের কোন কষ্টও তাদেরকে দমাতে পারেনি। তাঁরা কঠিন থেকে কঠিন সকল পথ আল্লাহর বড়ত্বের শ্লোগান দিতে দিতে অতিক্রম করতে থাকেন। শক্ত ও রুক্ষ এসব পাথর তাদের পথের ধুলায় পরিণত হয়ে তাঁদের মুখপানে তাকিয়ে থাকে, আর তাদের দৃঢ়তার ও অবিচলতার সেই কাফেলা অনেক মঞ্জিল সম্মুখে

অগ্রসর হতে থাকে।

یہ غازی ، یہ تیرے پراسراربندے

جنہیں تونے بخشا ہے ذوق خدائی

دوہم ان کی ٹھوکرسے صحراودریا

سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے رائی

"তোমার পথের এসব গাজী, তোমার এসব রহস্যপূর্ণ বান্দা,
যাদের হৃদয়ে তুমি তোমার দাসত্বে স্বাদ ভরে দিয়েছ।
এদের আঘাতে মরু ও সাগর দু'ভাগ হয়ে যেত,
গগনচুম্বী পাহাড় তাদের ব্যক্তিত্বের সম্মুখে সংকুচিত হয়ে
সরিষার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র হয়ে যেত।"

এই পাথুরে ভূমি থেকে কোন প্রকারে বের হওয়ার পর পুনরায় উপত্যকা শুরু হয়। একের পর এক অনেকগুলো গ্রাম অতিক্রান্ত হয়। আম্মান থেকে যাত্রা করার পর আমরা সম্ভবতঃ দেড়শ' কিলোমিটার পথ অতিক্রম করেছি। তারপর গিয়ে উদ্দীষ্ট গন্তব্যের নিদর্শন শুরু হয়। লোকেরা জানাল যে, মুতা এখন সন্নিকটেই। পথ জিজ্ঞেস করে করে অবশেষে আমরা মুতা পৌঁছেই যাই। এখন মুতার যুদ্ধ প্রান্তরের উত্তরে জমকালো এক বিশ্ববিদ্যালয় 'জামি'আ মুতা' নামে প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে। আমরা জামি'আর প্রধান ফটকের সম্মুখে গাড়ী রেখে লোকদের জিজ্ঞেস করলে তারা মুতার যুদ্ধ প্রান্তরের পথ বলে দেয়। ঐ প্রান্তরের উত্তর পাশে পুরাতন কিছু ভবনের ভগ্নাবশেষ রয়েছে। একজন খাদেম যিয়ারতকারীদের পথ প্রদর্শনের জন্য এখানে আছে। উত্তরে দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত বিস্তৃত একটি ময়দান। তার মধ্যে জায়গায় জায়গায় উঁচু নীচু দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। খাদেম বলল, এই ময়দান মুতার যুদ্ধের সময় থেকে অদ্যাবধি একই অবস্থায় রয়েছে এবং এখানে কখনও বিপ্লবাত্মক কোন পরিবর্তন ঘটেনি।

মুতার যুদ্ধ

অষ্টম হিজরীতে মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। ঘটনাটি এরূপ ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হারেছ বিন উমায়ের ইযদী (রাযিঃ) নামক একজন সাহাবীকে বসরা (সিরিয়া) এর বাদশাহর নিকট ইসলামের দাওয়াত দেওয়ার জন্য একটি পত্র সহকারে পাঠান। তিনি বসরা পৌছার পূর্বেই পথিমধ্যে শুরাহবিল বিন আমর গাস্সানী তাঁকে গ্রেফতার করে বসরার শাসকের নিকট পেশ করে এবং সে তাকে হত্যা করে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূতদের মধ্যে একমাত্র হযরত হারেছ বিন উমায়ের (রাযিঃ)কে এভাবে শহীদ করা হয়।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এই দুর্ঘটনার সংবাদ পেয়ে অত্যন্ত মর্মাহত হন। দূত হত্যা সে যুগেও আন্তর্জাতিক আইন ও প্রথা অনুযায়ী নিকৃষ্টতম বিশ্বাসঘাতকতা এবং অমানবিক আচরণ বলে গণ্য হত। এবং একে অত্যন্ত নিম্নমানের যুদ্ধের ঘোষণাও মনে করা হত। যদিও সে সময় মুসলমানগণ বিভিন্ন সমস্যায় আক্রান্ত ছিলেন এবং তখনও পবিত্র মক্কা বিজয় হয়নি। এরূপ পরিস্থিতিতে সিরিয়া ও রোমের শক্তির সঙ্গে টক্কর দিয়ে নতুন একটি বিপজ্জনক যুদ্ধক্ষেত্র উন্মুক্ত করা সহজ ব্যাপার ছিলো না। কিন্তু একজন সাহাবী বিশেষত তিনি দূত—তাঁকে বিনা কারণে এভাবে হত্যা করার বিষয়টিও এমন সাধারণ ছিল না যে, তা দেখে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নীরব বসে থাকতে পারেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন সাহাবায়ে কেরামকে একত্রিত করে এই দুর্ঘটনা সম্পর্কে অবহিত করেন। তার সঙ্গে একটি সেনাবাহিনীও গঠন করেন। এর নেতৃত্ব স্বীয় পুত্র হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ)এর উপর ন্যস্ত করেন। সঙ্গে সঙ্গে একথাও বলেন যে, হযরত যায়েদ বিন হারেছা যদি শহীদ হন তবে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রাযিঃ)কে আমীর বানাবে। যদি তিনিও শহীদ হন তাহলে হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ)কে সেনাপতি নির্ধারণ করবে এবং তিনিও শহীদ হলে মুসলমানগণ পরস্পরে পরামর্শ করে যাকে ইচ্ছা

আমীর মনোনীত করবে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এভাবে পরপর তিনজন আমীরের নাম নির্ধারণ করা একটি অস্বাভাবিক ব্যাপার ছিল এবং এতে স্পষ্টতঃ এরূপ ইঙ্গিতও ছিল যে, উক্ত বুযুর্গত্রয় এই যুদ্ধে শাহাদতে ভূষিত হবেন। সুতরাং এক ইহুদী যে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কথা শুনছিল সে হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ)কে বলল ঃ 'বনী ইসরাইলের মধ্যে এ কথাটি প্রসিদ্ধ ছিল যে, কোন নবী কোন যুদ্ধে সেনাদল প্রেরণকালে পরপর কয়েক ব্যক্তির নাম নিয়ে যদি একথা বলতেন যে, যদি অমুক শহীদ হয় তাহলে এরূপ করবে। তখন ঐ ব্যক্তি অবশ্যই শহীদ হত। অতএব হে যায়েদ! মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যদি সত্যিই নবী হয়ে থাকেন তাহলে তুমি আর তাঁর নিকট ফিরে আসবে না।' ইহুদী হয়ত মনে করেছিল যে, হযরত যায়েদ (রাযিঃ) একথা শুনে ভীত হয়ে পড়বে কিন্তু হযরত যায়েদ (রাযিঃ) অত্যন্ত নির্ভীকভাবে উত্তর দিলেন, 'তাহলে শুনে রাখ! আমি সাক্ষ্য দিতেছি যে, তিনি সত্য ও পবিত্র নবী।'

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁর পবিত্র হাতে হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ)কে পতাকা অর্পণ করেন। তিন হাজার সাহাবায়ে কেরাম সম্বলিত এই বাহিনী যখন পবিত্র মদীনা থেকে যাত্রা করে, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম স্বয়ং এবং পবিত্র মদীনার অধিবাসীদের বড় একটি দল তাদেরকে 'আলবেদা' (বিদায়) জানানোর জন্য ছানিয়াতুল বেদা পর্যন্ত গমন করেন। সেনাবাহিনীর যাত্রাকালে উপস্থিত লোকেরা দু'আ করল—

صحبكم الله و دفع عنكم، و ردكم صالحين غانمين

"আল্লাহ তোমাদের সঙ্গী হন, তিনি তোমাদের বিপদাপদ দূর করেন এবং তোমাদেরকে সহীহ সালামতে বিজয় ও সফলতা দিয়ে ফিরিয়ে আনেন।"

হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ) অত্যন্ত উঁচু স্তরের কবি ছিলেন। তিনি তাঁদের এ দু'আ শুনে নিম্নের কবিতা আবৃত্তি করেন—

لكننى اسأل الرحمن مغفرة - وضربت ذات فرغ تقذ الزبرا

او طعنة بيدى حران مجهزة - بحربة تنفذ الاحشاء والكبدا

حتى يقال إذا مروا على جدتى - ارشده الله من غازوقد رشدا

"কিন্তু আমি তো আল্লাহর মাগফেরাত কামনা করছি এবং তরবারীর এমন এক শক্ত আঘাতের সন্ধান করছি, যে তরবারী আমার দেহ চিরে ফেলবে এবং রক্তের ফেনা উথলে উঠবে অথবা কোন হাররানী ব্যক্তির হাতের বর্শার মোক্ষম আঘাত, যেই বর্শা আমার আতুরী এবং কলিজা পার হয়ে যাবে, এমনকি যখন মানুষ আমার কবর অতিক্রম করবে, তখন বলবে, এই গাজীকে আল্লাহ পাক হেদায়েত দিয়েছিলেন এবং সে হেদায়েতের অভিষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছেছে।"

শাহাদতের এরূপ উদগ্র বাসনা হৃদয়ে পোষণ করে এই কাফেলা সিরিয়া অভিমুখে যাত্রা করে। তাঁদের ধারণা ছিল তাঁদের মোকাবেলা হবে বসরার শাসকের সঙ্গে। বাহ্যতঃ এরূপ সম্ভাবনা দেখা দেয়নি যে, রোমের সেই সুপার পাওয়ার তিন হাজার সদস্যের এই বাহিনীর প্রতিশোধমূলক এই আক্রমণকে এত গুরুত্ব দেবে যে, তাদের সম্পূর্ণ সমরশক্তি এর মোকাবেলায় বের করে আনবে। কিন্তু সাহাবায়ে কেরাম যখন জর্দানের মা'আন অঞ্চলে পৌছেন (বর্তমানেও সে অঞ্চলের নাম মা'আন রয়েছে এবং একে জর্দানের গুরুত্বপূর্ণ একটি শহর মনে করা হয়) তখন জানতে পারেন যে, স্বয়ং রোম সম্রাট হেরাক্লিয়াস এক লক্ষ সৈন্য নিয়ে মা'আব অঞ্চল পর্যন্ত পৌছে গেছে এবং লাখাম, যুজাম, কীন, বাহরা প্রভৃতি গোত্র, এক লাখ সৈন্য তাদের সাহায্যের জন্য প্রেরণ করেছে। অপ্রত্যাশিত এ সংবাদের অর্থ এই দাঁড়ায় যে, তিন হাজার লোককে দুই লক্ষ লোকের সঙ্গে মোকাবেলা করতে হবে।

বলা বাহুল্য যে, নতুন এ অবস্থা তাঁদের জন্য বিশেষভাবে চিন্তা ভাবনা ও নতুন করে পরামর্শ করার দাবীদার ছিল। সুতরাং সাহাবায়ে কেরাম সেই মা'আন নামক জায়গায় পরামর্শ করার জন্য একত্রিত হন। অনেকেই এই মত দেন যে, এ অবস্থা সম্পর্কে আমাদের যেহেতু পূর্বে ধারণা ছিল না তাই এ বিষয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে

অবগত করা উচিত। হতে পারে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সংবাদ শুনে আরো সাহায্যের ব্যবস্থা করবেন অথবা ভিন্ন কোন নির্দেশ দিবেন।

বাহ্যত তাঁদের একথা অত্যন্ত যুক্তিযুক্ত ছিল এবং বাহ্যিক উপকরণের অধীনে রণকৌশলের দাবীও তাই ছিল। সুতরাং অনেক সাহাবী এই মত অনুযায়ী কাজ করার দিকে ধাবিত হচ্ছিলেন। ঠিক এই অবস্থাতে হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ) দাঁড়িয়ে যান এবং নিম্নের এই আবেগময় ভাষণ প্রদান করেন—

"হে আমার জাতি! যে বস্তুর কারণে তোমরা এখন সন্ত্রস্ত হচ্ছ, আল্লাহর কসম! এটিই সেই বস্তু, যার খোঁজে তোমরা মাতৃভূমি থেকে বের হয়েছ আর তা হলো শাহাদত। স্মরণ রেখ, আমরা যখনই কোন যুদ্ধে লড়েছি, তখন না সংখ্যার আধিক্যের ভিত্তিতে লড়েছি, না হাতিয়ার এবং অশ্বের উপর ভিত্তি করে লড়েছি। বদর যুদ্ধে আমি শরীক ছিলাম। আল্লাহর কসম! তখন আমাদের নিকট মাত্র দুটি ঘোড়া ছিল। আমি উহুদের যুদ্ধে শরীক ছিলাম, তখন আমাদের নিকট একটি মাত্র ঘোড়া ছিল। তবে হাঁ, যে জিনিসের ভিত্তিতে সর্বদা আমরা লড়েছি। তা হলো আমাদের এই দ্বীন। যে দ্বীন দ্বারা আল্লাহ পাক আমাদেরকে সম্মানে ভূষিত করেছেন। তাই আমি তোমাদের নিকট আবেদন করছি তোমরা সম্মুখে অগ্রসর হও। দুই সৌভাগ্যের একটি নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য অবধারিত রয়েছে। হয়ত তোমরা শত্রুপক্ষের উপর বিজয়ী হবে এবং এমনিভাবে আল্লাহ ও আল্লাহর রাসূলের সে অঙ্গীকার পূর্ণ হবে, যা কখনই মিথ্যা হতে পারে না। অথবা তোমরা শহীদ হয়ে বেহেশতের বাগানসমূহে তোমাদের ভাইদের সঙ্গে মিলিত হবে।"

ব্যাস, আর কি চাই, সমস্ত সাহাবায়ে কেরাম শাহাদতের উদ্দীপনায় উজ্জীবিত হয়ে কোমর বেঁধে জিহাদের জন্য প্রস্তুত হয়ে গেলেন। সেনাবাহিনী মাআন থেকে যাত্রা করে প্রথমে মুশারিক এবং পরে মুতায় ক্যাম্প করে। তারপর মুতার এই প্রান্তরেই সেই মারাত্মক যুদ্ধ সংঘটিত হয়। উভয় বাহিনী মুখোমুখী হয়ে প্রচণ্ড যুদ্ধে ঝাপিয়ে পড়ে। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ) শহীদ হয়ে যান।

তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের হেদায়েত অনুযায়ী হযরত জাফর বিন আবি তালেব (রাযিঃ) পতাকা উঠিয়ে নেন। প্রচণ্ড লড়াইয়ের মাঝে চতুর্দিক থেকে বর্শা ও তীরবৃষ্টি হচ্ছিল। এমতাবস্থায় হযরত জাফর (রাযিঃ)এর জন্য ঘোড়ার উপর থাকা দুস্কর হয়ে পড়ায় তিনি ঘোড়া থেকে অবতরণ করে পদব্রজে শত্রুর কাতারে ঢুকে যান। তখন জনৈক শত্রু তাঁর উপর তরবারীর আঘাত করলে পতাকা ধারণকৃত ডান হাত কেটে পড়ে যায়। হযরত জাফর (রাযিঃ) পতাকা বাম হাতে ধরে ফেলেন। তার বাম হাতেও একজন তরবারীর আঘাত করে। ফলে উভয় হাত কেটে পড়ে যায়। হযরত জাফর (রাযিঃ)এর যতক্ষণ জীবন আছে ততক্ষণ পতাকা ছাড়া পছন্দ ছিল না। তিনি পতাকা কাটা হাতের বাজুর মধ্যে দাবিয়ে ধারণ করতে প্রয়াস পান। কিন্তু তরবারীর তৃতীয় আঘাত তাঁকে তাঁর গন্তব্যে পৌঁছে দেয়। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উমর (রাযিঃ) বর্ণনা করেন যে, যুদ্ধ শেষে তাঁর পবিত্র দেহে বর্শা ও তরবারীর পঞ্চাশটি আঘাত দেখতে পাওয়া যায়। যার একটিও তাঁর পৃষ্ঠদেশে ছিল না। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করেছেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বলে দেওয়া ধারা অনুযায়ী এখন হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ)এর পালা ছিল। তিনি পতাকা উঠিয়ে নেন। শত্রুর দিকে অগ্রসর হন। নাজানি কখন থেকে পেটে কোন খাবার পড়েনি তাই হয়ত মুখমণ্ডলে ক্ষুধার দুর্বলতার চিহ্ন ফুটে ওঠে। তাঁর এক চাচাত ভাই এ অবস্থা দেখে কয়েক টুকরা গোশত জোগাড় করে তাঁর সামনে পেশ করে বলেন—"এই কয়েক দিন আপনি অত্যন্ত পরিশ্রম করেছেন। এগুলো খেয়ে নিন। তাহলে পিঠটা সোজা রাখতে পারবেন।" হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) তাঁর হাত থেকে গোশত নিয়ে মাত্র খেতে আরম্ভ করেছেন এমতাবস্থায় এক কোণা থেকে মুসলমানদের উপরে অতর্কিত তীব্র আক্রমণের আওয়াজ শোনা গেল। হযরত আবদুল্লাহ ইবনে রাওয়াহা (রাযিঃ) তখন নিজেকে নিজে সম্বোধন করে বললেন ঃ এ রকম অবস্থাতেও তুমি দুনিয়ার কাজে বিভোর। একথা বলে গোশত রেখে দেন, তরবারী উঠিয়ে নেন এবং শত্রুর সারিতে ঢুকে পড়েন। এবং যুদ্ধ করতে করতে সেখানেই রূহের স্রষ্টার

হাতে রূহ অর্পণ করেন। আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করেছেন।

উক্ত বুযুর্গত্রয়ের পর অন্য কারো নাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নির্ধারণ করেননি। বরং মুসলমানদের পরস্পর পরামর্শের উপর তা ছেড়ে দিয়েছেন। সুতরাং হযরত সাবেত ইবনে আকরাম (রাযিঃ) মাটি থেকে পতাকা উঠিয়ে নেন ঠিক কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুসলমানদেরকে সম্বোধন করে একথাও বলেন যে, নিজেদের মধ্য থেকে কোন একজনকে আমীর বানানোর ব্যাপারে একমত হয়ে যাও। লোকেরা বলল ঃ এখন আপনিই আমীর হয়ে যান। কিন্তু হযরত সাবেত বিন আকরাম (রাযিঃ) এতে রাজী হলেন না। অবশেষে মুসলমানগণ সর্বসম্মতিক্রমে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাযিঃ)কে আমীর নির্ধারণ করেন। হযরত সাবেত (রাযিঃ) পতাকা তাঁকে হস্তান্তর করেন। হযরত খালিদ (রাযিঃ) অকুতোভয় হয়ে লড়তে থাকেন। সেদিন তাঁর প্রচণ্ড লড়াইয়ে তাঁর হাতে নয়টি তরবারী ভেঙ্গে যায়। পরিশেষে আল্লাহ তাআলা মুসলমানদেরকে বিজয় দান করেন এবং হযরত খালিদ (রাযিঃ) মুসলিম সৈন্যবাহিনীকে নিরাপদে ফিরিয়ে আনতে সফল হন।

ওদিকে পবিত্র মদীনায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ যুদ্ধের বিভিন্ন অবস্থা সম্পর্কে অনবহিত ছিলেন না। সিরিয়া থেকে কোন দূত যুদ্ধের সংবাদ নিয়ে আসার পূর্বেই একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবায়ে কেরামকে সম্বোধন করে এরশাদ করলেন, যায়েদ পতাকা উঠিয়ে নিয়েছিল, সে শহীদ হয়ে যায়। পরে জাফর উঠিয়ে নেয়, সেও শহীদ হয়। এরপর ইবনে রওয়াহা উঠিয়ে নেয় এবং সেও শহীদ হয়। একথা বলে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র চক্ষু অশ্রুতে ভরে যায়। পরে বলেন ঃ শেষে পতাকা আল্লাহর তরবারীসমূহের মধ্য থেকে একটি তরবারী (হযরত খালিদ (রাযিঃ)) উঠিয়ে নেয়। তখন আল্লাহ পাক তাঁকে বিজয় দান করেন।

হযরত জাফর বিন আবু তালিব (রাযিঃ)এর স্ত্রী হযরত আসমা বিনে উমাইস (রাযিঃ) বলেন ঃ যুদ্ধের দিনগুলোতে আমি বাড়ীতে ছিলাম। আমি আমার বাচ্চাদেরকে পরিস্কার পরিচ্ছন্ন করে গোসল দিয়ে প্রস্তুত

করেছি। এ অবস্থায় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আমার ঘরে তাশরীফ আনেন এবং বাচ্চাদেরকে কাছে ডেকে নেন। তাদেরকে গলায় জড়িয়ে ধরে আদর করতে থাকেন। আমি লক্ষ্য করলাম হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চক্ষুদ্বয় অশ্রুতে ভরে গেছে। আমি নিবেদন করলাম—"হে আল্লাহর রসূল! আমার মাতাপিতা আপনার উপর কুরবান হোক, আপনি কাঁদছেন কেন? জাফর এবং তাঁর সাথীদের ব্যাপারে কোন খবর এসেছে কি?"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ "তাঁরা আজ শহীদ হয়েছে।"

হযরত আসমা (রাযিঃ) বলেন ঃ 'একথা শুনে হঠাৎ আমার মুখ দিয়ে চিৎকার বের হয়ে যায়। মহিলারা আমার নিকট জমা হতে থাকে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাইরে তাশরীফ নিয়ে যান এবং বাড়ীতে গিয়ে বলেন ঃ "জাফরের পরিবারের লোকদের জন্য খাবার তৈরী করে পাঠিয়ে দাও।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সে সময় এই সুসংবাদও দান করেন যে, আল্লাহ তাআলা বেহেশতে জাফরকে তাঁর হাতের পরিবর্তে এমন দুটি ডানা দান করেছেন, যার দ্বারা তিনি যেখানে ইচ্ছা উড়ে যেতে পারেন। এজন্যই হযরত জাফর (রাযিঃ)এর উপাধি 'তাইয়ার' (উড়ন্ত) প্রসিদ্ধ হয়ে যায়।

মুতা প্রান্তর

এসব ঘটনা কিতাবে পড়েছিলাম, আর আজ সেই ময়দান পাপী চক্ষুর সম্মুখে বিরাজ করছে, যেখানে সাহাবায়ে কেরাম তাঁদের পবিত্র লহু দ্বারা বীরত্ব ও উৎসর্গকরণের এই ইতিহাস লিখেছিলেন। কল্পনার চক্ষু সেই প্রান্তরের বিভিন্ন কোণায় উত্থান পতনের সেই সংঘর্ষের বিভিন্ন দৃশ্য প্রত্যক্ষ করতে থাকে। যে সংঘর্ষ এসব সাহাবাদেরকে ফেরেশতাদের থেকেও উচু মাকামে অধিষ্ঠিত করে। কবিতা ঃ

مقام بندگی دیگر، مقام عاشقی دیگر

زنوری سجده می خواهی، زخاکی بیش ازاں خواهی

"দাসত্বের মাকাম আর প্রেমের মাকামের মাঝে বহু যোজন দূরত্ব রয়েছে। নূরের তৈরী ফেরেশতাদের কাছে চাইলে দাসত্বের সিজদা, আর মাটির তৈরী মানুষের কাছে চাইলে বহু ঊর্ধ্বের সেই প্রেমলীলা।"

আমার স্মৃতি তখনও এসব কল্পনায় নিমগ্ন ছিল। এমতাবস্থায় এই প্রান্তরের এ অঞ্চলেরই একজন খাদেম একটি জায়গার দিকে ইশারা করে বললেন ঃ এই স্থানে হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ) শাহাদত বরণ করেন। এখানে কয়েক ফুট উঁচু পাথরের তৈরী একটি খুঁটি বসানো আছে, তাতে অস্পষ্ট অক্ষরে লিখিত এই কথাগুলো পড়া যাচ্ছিল ঃ

(হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ) এস্থানে শহীদ হয়েছেন)। এর থেকে কিছু দূরে হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ)এর শাহাদতের স্থান। সেখানেও এ ধরনের একটি খুঁটি বসানো আছে। খাদেম বলল ঃ এখান থেকে দক্ষিণ দিকে প্রায় ১ কিলোমিটার দূরে ময়দানের মাঝ বরাবর একটি জায়গা আছে। হযরত জাফর তাইয়ার (রাযিঃ) সেখানে শহীদ হয়েছেন বলে প্রসিদ্ধ আছে। এ জায়গায় ভূগর্ভস্থ একটি সুড়ঙ্গের মত রয়েছে। খাদেম বলল ঃ কোন এক সময় এই সুড়ঙ্গ থেকে সুগন্ধ আসত বলে এখানে প্রসিদ্ধ ছিল। জনৈক ব্যক্তি বিষয়টি যাচাই করার জন্য এর ভিতরে প্রবেশ করে। কিন্তু সে আর ফিরে আসেনি। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ), হযরত জাফর তাইয়্যার (রাযিঃ) এবং হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ)এর মাযার ময়দান থেকে বেশ দূরে একটি বস্তিতে অবস্থিত। সম্ভবতঃ এদের মাযার থাকার কারণেই এ বস্তির নাম 'মাযার' প্রসিদ্ধ হয়েছে। সুতরাং আমরা মুতা প্রান্তর থেকে সেই বসতির উদ্দেশ্যে যাত্রা করি। সেখানে সর্বপ্রথম হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ)এর পবিত্র মাযারে হাজির হওয়ার এবং সালাম পেশ করার সৌভাগ্য হয়।

হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ)

হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ) সাহাবায়ে কেরামের মধ্যে বেশ কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী ছিলেন। সকল সাহাবাদের মধ্যে একমাত্র

তাঁরই এই বৈশিষ্ট্য রয়েছে যে,তাঁর নাম পবিত্র কুরআনে উল্লেখিত হয়েছে।

فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا

এ সম্মান অন্য কোন সাহাবীর হাসিল হয়নি। এমনিভাবে তাঁর আরেকটি বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সৌভাগ্য এও রয়েছে যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নিজের পালকপুত্র বানিয়েছিলেন। এ বিষয়ের কাহিনীটিও বড় বিচিত্র ঃ

হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ)এর পিতা (হারেছা) বনু কাআব গোত্রের লোক ছিলেন, আর তাঁর মাতা সু'দা ছিলেন বনু ম'আন গোত্রের। হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর বাল্যকালে তাঁর মাতা তাঁর পিত্রালয়ে যান। তখন তিনি তাকেও সঙ্গে নিয়ে যান। সেটা ছিল জাহেলিয়াতের যুগ। সে সময় আরবের বিভিন্ন গোত্রের মধ্যে যুদ্ধ চলতেই থাকত। হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর নানার বংশের উপর তাদের শত্রু পক্ষ আক্রমণ করে এবং হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে ক্রীতদাস বানিয়ে নেয়। ফলে তিনি মাতাপিতা থেকে অনেক দূরে দাসত্বের জীবনযাপন করতে থাকেন। একবার উকাযের মেলায় তাঁর মনিব তাঁকে বিক্রি করার জন্য নিয়ে আসে। ঘটনাচক্রে ঐ মেলায় উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযিঃ)এর ভাতিজা হযরত হাকীম বিন হিযাম (রাযিঃ) (জিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দুধভাইও ছিলেন) তাশরীফ আনেন এবং চারশ' দিরহামের বিনিময়ে তার ফুফু হযরত খাদীজার জন্য এই দাস ক্রয় করেন।

পরে যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে হযরত খাদীজার বিবাহ হয়, তখন তিনি গোলাম হিসেবে হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ)কে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দান করেন। তাই তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত দাসে পরিণত হন।

ওদিকে হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর পিতা হারেছা ছেলের খোঁজে দিশেহারা ছিলেন। তিনি তাঁর কোন খোঁজ পাচ্ছিলেন না। পুত্রের স্মরণে তিনি এই কবিতাও আবৃত্তি করেন।

بكيت على زيد ولم أدر ما فعل

أحى فيرجى، أم أتى دونه الأجل

"আমি যায়েদের জন্য অশ্রু বিসর্জন করছি,
আমি অবগত নই যে তার কি হয়েছে।
আমার জানা নাই যে, সে বেঁচে আছে,
আর আমি তার মিলনের প্রত্যাশা করব,
নাকি তার মৃত্যু এসে গেছে।"

হজ্জের মওসুম এলে বুন কালব গোত্রের কিছু লোক হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র মক্কায় আসে। তারা সেখানে হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে দেখে চিনতে পারে এবং হযরত যায়েদ (রাযিঃ)ও তাদেরকে চিনতে পারেন। তিনি তাদেরকে একটি কবিতা শুনিয়ে বলেন, আমার এই কবিতা আমাদের পরিবারের লোকদের নিকট পৌঁছে দিও ঃ

احن إلى قومى و إن كنت نائيا

بأنى قطين البيت عند المشاعر

"যদিও আমি দূরে অবস্থান করছি, কিন্তু এখনও আমি আমার স্বজাতিকে স্মরণ করে থাকি। আমি পবিত্র স্থানসমূহের নিকট বায়তুল্লাহর প্রতিবেশী হয়েছি।"

এরা ফিরে গিয়ে হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর পিতার নিকট সম্পূর্ণ ঘটনা শোনাল এবং হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর ঠিকানা জানিয়ে দিল। হারেছা হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর চাচা কাআবকে সঙ্গে করে তাঁর খোঁজে পবিত্র মক্কায় এসে পৌঁছলেন। সেখানে এসে জানতে পারেন যে, তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ক্রীতদাস অবস্থায় আছেন। তারা লোকদেরকে জিজ্ঞেস করে করে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে পৌঁছেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন মসজিদে হারামে অবস্থান করছিলেন। তারা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এসে নিবেদন করলেনঃ'আপনি আবদুল মুত্তালিবের সন্তান। তিনি স্বজাতির নেতা ছিলেন। আপনারা পবিত্র কাবাগৃহের

হেফাজতকারী, আপনাদের সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, আপনারা ক্রীতদাসদেরকে মুক্ত করে দেন এবং কয়েদীদের খাবার খাওয়ান। আমার ছেলে আপনার ক্রীতদাস। আমি তার বিষয়ে আপনার সঙ্গে কথা বলতে এসেছি। আপনি আমাদের উপর কৃপা করুন। আপনি মুক্তিপণ স্বরূপ যা চাইবেন আমরা তাই দিতে রাজী আছি। আপনি মুক্তিপণ নিয়ে তাকে ছেড়ে দিন। আর সে হলো, আপনার ক্রীতদাস যায়েদ বিন হারেছা।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ এ তো জটিল কোন বিষয় নয়। আমি এখনই তাকে ডেকে আনছি। আপনারা তার নিকট থেকে তার ইচ্ছা জেনে নিন। সে যদি আপনাদের সঙ্গে যেতে চায়, তাহলে কোনরূপ মুক্তিপণ ছাড়াই আমি তাকে আপনাদের হাতে দিয়ে দেব। কিন্তু সে যদি নিজের থেকে আমার সঙ্গে থাকতে পছন্দ করে, তাহলে যে ব্যক্তি আমার সঙ্গে থাকা পছন্দ করে তাকে মুক্ত করে দিয়ে মুক্তিপণ গ্রহণ করা আমার পক্ষে সম্ভব নয়।

তারা বলল ঃ আপনি তো আমাদের অর্ধেকের বেশী সমস্যা সমাধান করে দিয়েছেন। (তাদের ধারণা ছিল যে, হযরত যায়েদ (রাযিঃ) নিশ্চয়ই তার বাপ ও চাচার সঙ্গে যেতে পছন্দ করবে।) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদকে ডেকে এনে জিজ্ঞেস করলেন ঃ এই দুই ব্যক্তিকে তুমি চেন? হযরত যায়েদ বললেন ঃ জ্বি হাঁ, ইনি আমার পিতা আর উনি আমার চাচা।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ তুমি আমার সঙ্গে দীর্ঘদিন ছিলে। এখন তোমার ইচ্ছা, তুমি চাইলে আমার সঙ্গে থাকতে পার আর চাইলে তাদের সাথে যেতে পার।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) উত্তরে বললেন ঃ আমি আপনার মোকাবেলায় কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না। আপনিই আমার পিতা এবং আপনিই আমার চাচা।

তার পিতা এবং চাচা একথা শুনে চিৎকার করে বলেন ঃ যায়েদ! এ তোমার কি হল? তুমি দাসত্বকে মুক্তির উপর এবং আপন বাপ ও চাচা এবং পরিবারের লোকদের উপর অপরিচিত এক ব্যক্তিকে প্রাধান্য দিচ্ছ।

হযরত যায়েদ (রাযিঃ) উত্তরে বললেন ঃ জ্বি হাঁ। আমি এই

ব্যক্তিত্বের নিকট এমন এক বস্তু দেখেছি, যা দেখার পর তাঁর মোকাবেলায় কাউকে প্রাধান্য দিতে পারি না।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ)এর এই কথোপকথন শুনে তাঁর হাত ধরে হাতিমে নিয়ে যান এবং উচ্চস্বরে ঘোষণা করেন ঃ তোমরা সকলে সাক্ষী থেক, আজ থেকে যায়েদ আমার ছেলে। সে আমার উত্তরাধিকারী হবে এবং আমি তার উত্তরাধিকারী হব।[১]

হযরত যায়েদ (রাযিঃ)এর পিতা এবং চাচা এই দৃশ্য দেখে নিশ্চিন্ত হলেন এবং সন্তুষ্টচিত্তে বাড়ী ফিরে গেলেন। এরপর থেকে লোকেরা হযরত যায়েদ (রাযিঃ)কে 'যায়েদ বিন হারেছা'র পরিবর্তে 'যায়েদ বিন মুহাম্মদ' বলতে থাকে। তারপর যখন পবিত্র কুরআনে সূরায়ে আহযাবের সেই আয়াতগুলো অবতীর্ণ হয়, যার মধ্যে এ নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, 'পালক ছেলেকেও তার প্রকৃত পিতার দিকে সম্পৃক্ত করে ডাকা উচিত।' তখন থেকে তাঁকে যায়েদ বিন হারেছা বলা হতে থাকে।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ)কে অনেকগুলো যুদ্ধের আমীর নিযুক্ত করেন। আর এমনিভাবে তিনি হাতে কলমে এই শিক্ষা দেন যে, ইসলামে একমাত্র তাকওয়াই মর্যাদার মাপকাঠি। দাসত্ব আর স্বাধীনতা নয়। পরিশেষে শেষবারের মত তাঁকে মুতার যুদ্ধের নেতৃত্ব সোপর্দ করা হয়। আর সেই মহান ব্যক্তিত্ব যিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বন্ধুত্ব ও সাহচর্যের খাতিরে তার বাপ চাচা এবং পুরো পরিবারকে ত্যাগ করেছিলেন, আল্লাহর দ্বীনের খাতিরে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে প্রায় এক হাজার কিলোমিটার দূরে অপরিচিত এই ভূখণ্ডে বিশ্রামরত আছেন। আল্লাহ তাঁর উপর সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকেও সন্তুষ্ট করেছেন।

হযরত যায়েদ বিন হারেছা (রাযিঃ)এর মাযার সংলগ্ন বিশাল এক

টীকা–১ ঃ ইসলামের প্রথম যুগে পালকপুত্রকে ওয়ারিস সাব্যস্ত করা হত। পরবর্তীতে কুরআনে কারীমে এ বিধান রহিত করা হয়েছে। অতএব এখন আর পালকপুত্রকে ওয়ারিস বানানো বৈধ নয়। এতদব্যতীত পরে এ হুকুমও এসেছে যে, নবীদের (সাঃ) পরিত্যক্ত সম্পত্তি বন্টন হয় না।

মসজিদ রয়েছে। আমরা জোহর নামায ঐ মসজিদেই আদায় করি।

হযরত জাফর তাইয়্যার (রাযিঃ)এর মাযারে

এখান থেকে কিছু দূরে হযরত জাফর তাইয়্যার (রাযিঃ)এর মাযার। সেখানেও হাজির হওয়ার এবং সালাম করার সৌভাগ্য হয়। হযরত জাফর তাইয়্যার (রাযিঃ) হযরত আলী (রাযিঃ)এর বড় ভাই ছিলেন। তিনি হযরত আলী থেকে দশ বছরের বড় ছিলেন। নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর দেহাকৃতির খুব বেশী সাদৃশ্য ছিল। একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে সম্বোধন করে এরশাদ করেন ঃ

"তুমি গঠন ও স্বভাব চরিত্র উভয় দিক থেকে আমার সদৃশ।"

হযরত জাফর নিঃস্ব দরিদ্রদের লালন পালন করতেন। অসহায়দেরকে খুব বেশী সাহায্য করতেন। যে কারণে 'আবুল মাসাকিন' (অসহায়দের পিতা) তাঁর উপাধি প্রসিদ্ধ হয়। হযরত আবু হুরায়রা (রাযিঃ) বলতেন ঃ 'রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পর জাফর ইবনে আবু তালিব (রাযিঃ) সকল মানুষের শ্রেষ্ঠ মানব।' তিনি কাফেরদের জুলুম নির্যাতনে অতীষ্ঠ হয়ে হাবশা হিজরত করেন এবং তিনিই নাজ্জাশীর দরবারে সেই প্রভাবপূর্ণ ঐতিহাসিক ভাষণ দান করেন, যার ফলে নাজ্জাশী মুসলমান হয়ে যান। খায়বারের যুদ্ধের সময় যখন তিনি হাবশা থেকে প্রত্যাবর্তন করেন, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বাহিরে অগ্রসর হয়ে তাঁকে স্বাগতম জানান এবং তাঁর ললাটে চুম্বন করেন। এটি সপ্তম হিজরীর ঘটনা। এর পরবর্তী বছর অষ্টম হিজরীতেই মুতার যুদ্ধ সংঘটিত হয়। সেই যুদ্ধে তাঁর প্রাণ উৎসর্গকারী বীরত্ব এবং শাহাদতের ঘটনা পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন।

হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ)

এখান থেকে কিছু দূরে হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ)এর মাযার। সে মাযারও যিয়ারত করি। হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা

(রাযিঃ) একজন আনসারী সাহাবী ছিলেন। ইসলামপূর্ব যুগে তিনি কবিরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। তাঁর কবিতা সমগ্র আরবে প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু ইসলাম গ্রহণের পর তিনি নিয়মিত কাব্যচর্চা পরিহার করেন। একটি জিহাদের সফরকালে স্বয়ং রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে নির্দেশ দেন ঃ তোমার কবিতা দ্বারা কাফেলাকে উৎসাহিত কর। হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ) উত্তরে বলেন ঃ ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমি এসব ছেড়ে দিয়েছি। হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁর প্রতিবাদ করে বলেন ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কোন আদেশ করলে তা মানা উচিত। তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ) পরিবেশ পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধান করে নিম্নের কবিতাগুলো আবৃত্তি করেন ঃ

يا رب لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا

فأنزلن سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا

ان الكفار قد بغوا علينا وإن ارادوا فتنة ابينا

"প্রভু হে! আপনি তাওফীক না দিলে আমরা সত্যপথ প্রাপ্ত হতাম না। আমরা তোমার পথে না সদকা করতে পারতাম, না তোমার জন্য নামায পড়তে সক্ষম হতাম। তাই আপনিই আমাদের উপর প্রশান্তি অবতীর্ণ করুন এবং শত্রুর মুখে আমাদেরকে দৃঢ়পদ রাখুন। কাফেররা আমাদের বিরুদ্ধে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করছে। তারা বিপর্যয় সৃষ্টি করতে চাইলে আমরা তা করতে দেব না।"

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন উমরাতুল কাযার সময় মসজিদে হারামে প্রবেশ করেন এবং তাওয়াফের উদ্দেশ্যে সম্মুখে অগ্রসর হতে থাকেন, তখন হযরত আবদুল্লাহ বিন রওয়াহা (রাযিঃ) তার সঙ্গে সঙ্গে চলছিলেন এবং তাঁর জন্য পথ করে দিচ্ছিলেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকেও কয়েকটি যুদ্ধের আমীর নিযুক্ত করেন এবং সবশেষে তিনি মুতার যুদ্ধে সেনাপতি নিযুক্ত হন। এই যুদ্ধে তাঁর শাহাদতস্পৃহা এবং আল্লাহর পথে স্বীয় মস্তক বিলিয়ে দেওয়ার উৎসাহপূর্ণ ঘটনাসমূহ পূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে।

মুতার যুদ্ধ প্রান্তর এবং বুযুর্গত্রয়ের মাযারে উপস্থিতি এবং পরিণতিতে অর্জিত প্রশান্তি ও পুলক আজকের দিনের এমন এক অমূল্য সঞ্চয়, যা সারাজীবন অবিস্মরণীয় হয়ে থাকবে।

প্রায় দেড়টার দিকে আমাদের মুতার ময়দান এবং মুতার শহীদদের মাযার যিয়ারত শেষ হয়। এখন আমাদের এখান থেকে আম্মানের পথ ধরে সোজা দিমাশ্‌কে যাওয়ার ইচ্ছা। লোকদের জিজ্ঞেস করে জানতে পারলাম যে, আম্মান যাওয়ার আরও একটি তুলনামূলক সংক্ষিপ্ত পথ রয়েছে এবং তা কেন্দ্রীয় মহাসড়ক হওয়ায় অধিক জনবহুল। কিন্তু সেই মহাসড়কে পৌছতে ছোট একটি পথ ধরে অনেকক্ষণ চলতে হবে। গাড়ীর পেট্রোল কম ছিল। কতদূর গিয়ে পেট্রোল পাম্প পাব, সে সম্পর্কেও আমাদের ধারণা ছিল না। সেজন্য 'মাযার' বসতি থেকেই পেট্রোল নিতে চাচ্ছিলাম। এমনিতে জর্দানের সড়ক পথের মানচিত্রে এই দিকনির্দেশনা ছিল যে, ছোট পথগুলোতে পেট্রোল পাম্প কম রয়েছে। তাই দীর্ঘ কোন সফরে যাত্রা করার পূর্বে গাড়ীতে যথেষ্ট পরিমাণ পেট্রোল রয়েছে কিনা এ ব্যাপারে নিশ্চিত হোন।

কিন্তু মাযার বসতির এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত সন্ধান করেও কোন পেট্রোল পাম্প পাওয়া গেলো না। স্থানীয় কিছু লোকের দিক নির্দেশনায় একটি পেট্রোল পাম্পে গিয়ে পৌছি।কিন্তু তা বন্ধ ছিল। মালিককে খুঁজে পাওয়া গেল না। ফলে সামান্য যেটুকু পেট্রোল ছিল তা দিয়েই কোন প্রকারে কেন্দ্রীয় মহাসড়ক পর্যন্ত পৌছার চেষ্টা চালানো ছাড়া কোন উপায় ছিল না। সে সময় ঐ অঞ্চলে আড়াইটা/পৌনে তিনটার দিকে আসরের আযান হচ্ছিল। তাই তখন দিনও ফুরিয়ে যাচ্ছিল। অন্ধকার ঘনিয়ে আসার পূর্বেই আমরা আম্মান পৌছতে চাচ্ছিলাম।

সুতরাং আল্লাহ পাকের নাম নিয়ে আমরা সফর শুরু করলাম। কিন্তু কিছুদূর যাওয়ার পর গাড়ীর ফুয়েল মিটারের কাঁটা তার শেষ চিহ্ন ছুঁই ছুঁই করছিল। অপরদিকে আমাদের চতুর্পাশের পাথুরে ভূমি ও সড়ক এত নীরব যে, দূর-দূরান্ত পর্যন্তও কোন গাড়ী দেখা যাচ্ছিল না। কখনও দু'একটি গাড়ী আগে পিছে অতিক্রম করে যাচ্ছিল। কেন্দ্রীয় মহাসড়ক

কত দূর সে সম্পর্কে আমাদের কিছুই জানা ছিল না। যে কোন মুহূর্তে গাড়ী বন্ধ হয়ে যেতে পারে। আর যদি বন্ধ হয়, তাহলে বৃক্ষলতাশূন্য এই মরুভূমিতে কোন সাহায্য মেলা দুরুহ ব্যাপার। সকল সঙ্গী এই চিন্তায় নীরবও ছিল এবং কিছুটা বিষন্নও ছিল। মানবের দৃষ্টি সকাল–সাঝ উপায় উপকরণের উপরই নিবদ্ধ থাকে। সে এসব উপায় উপকরণের সন্ধানে দিবা–নিশী দিশেহারা থাকে। এবং এ বিশ্বাস থাকা সত্ত্বেও যে, এ সকল উপকরণ একজন উপকরণদাতার নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। মানুষ উপকরণদাতার পরিবর্তে উপকরণের সঙ্গেই সম্পর্ক বজায় রাখে। তবে যখনই বাহ্যিক উপকরণের সকল পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং মানুষ অনন্যোপায় হয়ে যায়, সে মুহূর্তে সেই আল্লাহর কথাই স্মরণ হয়। পবিত্র কুরআন মানবের এই দুর্বলতাকে এভাবে ব্যক্ত করেছে—

وَاِذَا رَكِبُوْا فِى الْفُلْكِ دَعَوُا اللّٰهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ

“আর যখন এরা নৌকায় আরোহণ করে তখনই মাত্র আল্লাহকে ডাকে এবং তারই জন্য নিখাঁদ বন্দেগী করে।”

সুতরাং আমরা আল্লাহর নিকট দু'আ করতে থাকি, যেন নিরাপদে কোন পেট্রোল পাম্প পর্যন্ত পৌছে যাই। ফুয়েল মিটার অনেক আগে থেকেই পেট্রোল শেষ হয়ে যাওয়ার নির্দেশ দিচ্ছিল, কিন্তু আল্লাহর মেহেরবানীতে গাড়ী তার পূর্ণ গতিতে চলতে থাকে। এমনকি ফুয়েল মিটারের কাঁটা শেষের চিহ্নতে পৌছার পর সাধারণ অবস্থাতে যতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করার প্রত্যাশা করা যায়, সেই দূরত্বও অতিক্রম করে গেল। কিন্তু গাড়ী বন্ধ হলো না। এখন যে কোন মুহূর্তে বিপদ আসতে পারে। এই আশা–নিরাশার মাঝে অনেকক্ষণ পর বহুদূরে দিগন্ত রেখায় একটি সড়কের চিহ্ন দৃষ্টিগোচর হল। সে সড়কে উভয়দিক থেকে গাড়ী দৌড়াচ্ছিল। এটিই সেই কেন্দ্রীয় মহাসড়ক, যার সম্পর্কে পূর্বে বলা হয়েছিল। দু'আ, দুরূদ পাঠ করতে করতে আল্লাহর মেহেরবানীতে আমরা সে মহাসড়কে পৌছে যাই। মহাসড়কের উপর দিয়ে কিছুদূর যাওয়ার পর বাম দিকে দুটি রেষ্টুরেন্ট এবং একটি পেট্রোল পাম্প পাওয়া যায়। সেখানে আমরা আসর নামায আদায় করি। সে সময় ক্ষুধা তার যৌবনে

অবস্থান করছিল। রেষ্টুরেন্টে বসে আহার করি। জর্দান এবং সিরিয়াতে খাবারের বিচিত্রতা ও বিভিন্নতা অনেক বেশী। তার মধ্য থেকে খুব কম খাবারই মুখে ধরে। কিন্তু শিক কাবাব (যেগুলোকে এখানে শিশ কাবাব বলে) এবং টিকা (যেগুলোকে এখানে আওসাল বলে) এখানকার লোকেরা খুব ভাল প্রস্তুত করে। আমরা এগুলোই চেয়ে নিলাম।

দীর্ঘ ক্লেশপূর্ণ এবং বিপদসংকুল একটি ভ্রমণের পর পরিস্কার পরিচ্ছন্ন সুন্দর পরিবেশের রেস্তোরাতে শান্তির এই মুহূর্তগুলো এবং প্রচণ্ড এই ক্ষুধায় সুস্বাদু এসব খাবারগুলো একজন মুসাফিরের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বড় নেয়ামত ছিল। রাতদিন আমরা এরূপ নিরাপত্তা এবং এমন আনন্দ ও স্বাদ দ্বারা না জানি কতবার পরিতৃপ্ত হই, কিন্তু সাধারণত আমাদের এসব নেয়ামতের অনুভূতিও হয় না। যখন বিপদ কেটে ওঠে এসব জিনিস হাতে আসে তখন এগুলোর দাম বুঝে আসে।

খাওয়ার পর আমরা পুনরায় চলতে আরম্ভ করি। যখন আমরা আম্মানের উপকণ্ঠে গিয়ে পৌঁছি, তখন সূর্যনৌকা তীরে ভীড়ছিল এবং তার বিদায়ী কিরণসমূহ রাত্রির আগমনের বার্তা শোনাচ্ছিল। আমাদের এখন দিমাশ্‌কে যেতে হবে। একটি সড়ক আম্মানের বাহির দিয়ে দিমাশক অভিমুখে চলে গেছে বলে জানতে পারি। এ সড়ক দিয়ে যেতে শহরে প্রবেশ করতে হয় না। আমরা সেই সড়ক ধরে চলতে থাকি। সড়কটি আম্মানের উত্তরদিকে একটি চন্দ্রাকৃতির অর্ধবৃত্ত তৈরী করে জর্দানের অপর একটি গুরুত্বপূর্ণ শহর জারকায় পৌঁছে গেছে। এ শহরটি আম্মানের নিকটেই অবস্থিত, বরং উভয় নগরীর বসতি বৃদ্ধি পেতে পেতে একটি শহরের রূপ লাভ করেছে। এখানে সড়কের ধারে খালিদ বিন ওলীদ নামে এক মসজিদে আমরা মাগরিব নামায আদায় করি এবং পুনর্বার সফর আরম্ভ করি। প্রায় রাত নয়টায় আমরা জর্দানের শেষ সীমান্তের একটি বসতি রমসাতে পৌঁছি। এর পরই সিরিয়ার অঞ্চল শুরু হয়েছে।

জর্দান নদী

এটি ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসের ঘটনা। এ বছরেরই অক্টোবর মাসে মাজমাউল ফিকহীল ইসলামীর বার্ষিক অধিবেশন আম্মানে

অনুষ্ঠিতব্য ছিল। তাতে অংশগ্রহণের জন্য আমার পুনরায় আম্মান যাওয়ার সুযোগ ঘটে। প্রথম সফরের সফরনামার বাকি অংশ বর্ণনা করার আগে এই দ্বিতীয় সফরের কিছু কথাও উল্লেখ করা যথার্থ মনে করছি।

এবারে আমি আম্মানে এক সপ্তাহ কাল অবস্থান করি, কিন্তু ফিকাহ একাডেমীর অধিবেশনসমূহে এত ব্যস্ত ছিলাম যে, অন্য কোথাও যাওয়ার সুযোগ কমই হয়েছে। 'রেজেন্সী প্যালেস' নামক সেখানকার প্রসিদ্ধ একটি হোটেলে থাকার ব্যবস্থা করা হয়েছিল এবং তারই একটি হলকক্ষে অধিবেশন চলছিল। তাই সকাল সন্ধ্যা হোটেলেই থাকতে হয়েছে। তবে অধিবেশন সমাপ্তির পর ব্যবস্থাপকগণ একদিন সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের জন্য সম্মিলিতভাবে জর্দানের বিশেষ বিশেষ জায়গা ভ্রমণের প্রোগ্রাম রেখেছিলেন। আমি যদিও তার বেশীর ভাগই ইতিপূর্বে দেখেছিলাম, কিন্তু এই কাফেলাটি অনেক আলেম উলামা সম্বলিত ছিল। ওয়াকফ বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের সেক্রেটারী ডঃ আবদুস সালাম আল আবাদী (যার প্রণীত তিন ভলিউম বিশিষ্ট গ্রন্থ 'আল মুলকিয়্যাতু ফি শরীয়াতিল ইসলামিয়া' এতদবিষয়ে একটি রাজকীয় মর্যাদার অধিকারী গ্রন্থ) পথপ্রদর্শকরূপে সঙ্গে ছিলেন। সফরসঙ্গীদের মধ্যে ডঃ মুস্তফা আজ জারকা, শায়েখ আলী আহমাদ আস সালুছ, শায়েখ মুহাম্মদ হিশাম আল বোরহানী, শায়েখ আবদুল লতিফ আলে সাদ এবং আরও অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্ব শরীক ছিলেন।

এই সফরে আমরা আসহাবে কাহাফের গুহা, মৃত সাগর এবং আগওয়ার অঞ্চলে যাই। এসব অঞ্চলের আলোচনা সবিস্তারে পূর্বে লিখেছি। তবে এইবার নতুন কয়েকটি জায়গায় যাওয়া হয়। তার মধ্যে প্রথমটি ছিল জর্দান নদী। মৃত সাগর ভ্রমণের পর ব্যবস্থাপকগণ আমাদেরকে জর্দান নদীর তীরে নিয়ে যান। নদীটি বর্তমানে জর্দান এবং ইসরাঈলের মাঝে যুদ্ধ বিরতির সীমানারূপে ব্যবহৃত হচ্ছে।

জর্দান নদী অনেক প্রাচীন একটি নদী। এই নদী দৈর্ঘ্যে ৩১৯ কিলোমিটার অঞ্চলব্যাপী বিস্তৃত। তার কিছু অংশ কেনান কিছু ফিলিস্তীন এবং কিছু সিরিয়াতে রয়েছে। এর আলোচনা প্রাচীনতম গ্রন্থসমূহে পড়েছিলাম। বাইবেলের বিভিন্ন ছহীফাতে অনেক জায়গায় এই নদী এবং

এর তীরে সংঘটিত ঘটনাসমুহের উল্লেখ পাওয়া যায়। পবিত্র কুরআনেও কমপক্ষে দুই জায়গায় এই নদীর নাম উল্লেখ না করে এর আলোচনা করা হয়েছে। প্রথম আলোচনা এসেছে সূরা আল ইমরানে যেখানে হযরত তালুত (আঃ)এর আমালেকা সম্প্রদায়ের সঙ্গে জিহাদের ঘটনা বিবৃত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত তালূত (আঃ) তাঁর সঙ্গীদেরকে বলেন—

إِنَّ اللَّهَ مُبْتَلِيكُمْ بِنَهَرٍ فَمَنْ شَرِبَ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي إِلَّا مَنِ اغْتَرَفَ غُرْفَةً بِيَدِهِ، وَ مَنْ لَّمْ يَطْعَمْهُ فَإِنَّهُ مِنِّي

"নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাআলা তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা করবেন। অতএব যে ব্যক্তি ঐ নদীর পানি পান করবে, তার সঙ্গে আমার কোন সম্পর্ক নাই। আর যে তা থেকে আস্বাদন করবে না, সে নিঃসন্দেহে আমার দলের অন্তর্ভুক্ত। তবে যে ব্যক্তি এক আজলা স্বহস্তে উঠিয়ে নিবে সে ছাড়া।"

মুফাসসিরীনে কেরাম বলেন এ নদী দ্বারা জর্দান নদী উদ্দেশ্য।

পবিত্র কুরআন সূরায়ে রুমে পুনরায় জর্দান নদীর দিকে ইঙ্গিত করেছে। অর্থাৎ যেখানে ইরানী সেনাবাহিনীর হাতে রোমানদের পরাজয়ের আলোচনা রয়েছে। এরশাদ হয়েছে—

الم غُلِبَتِ الرُّوْمُ فِيْ اَدْنَى الْاَرْضِ...

"আলিফ লাম মীম, রোমের লোকেরা নিকটতম ভূমিতে পরাজিত হয়েছে।"

মুফাসসিরীনে কেরাম লেখেন যে, এ আয়াতে 'নিকটতম ভূমি' দ্বারা জর্দান নদীর প্রান্তর বুঝানো হয়েছে। কেননা এ স্থানেই ইরান নরপতি খসরু পারভেজের সৈন্যবাহিনী রোমান বাহিনীকে চরমভাবে পরাজিত করে।

জর্দান নদীর প্রান্তর বিভিন্ন জাতির ও সভ্যতার লালনকেন্দ্র ছিল। এর তীরেই শত শত নবী প্রেরিত হয়েছেন এবং ইতিহাসের না জানি কত অধ্যায় এখানে রচিত হয়েছে। এর পশ্চিম তীর থেকে ফিলিস্তীনের অঞ্চল

শুরু হয়েছে। যাকে পবিত্র কুরআনের সব জায়গায় আরযে মুকাদ্দাসা এবং আরযে মুবারাকা (পবিত্র ভূমি) ইত্যাদি নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

বিভিন্ন কিতাবে জর্দান নদী এবং এর সাথে বিজড়িত ঐতিহাসিক ঘটনাবলী সম্পর্কে যা কিছু পড়েছিলাম, তার ভিত্তিতে কল্পনায় এমন একটি ধারণা জন্মে যে, এটি বড় কোন নদী হবে, কিন্তু এখানে পৌঁছে দেখি এটি চওড়ায় এত ছোট যে, একে নদী না বলে বরং খাল বলাই যথার্থ মনে হয়। এর প্রস্থ খুব বেশী হলে আমাদের পাকিস্তানের 'সোয়াদ' বা 'কনহার' নদীর সমান হবে এবং অনেক জায়গায় এর চেয়েও কম এবং শীতকাল হওয়ার কারণে এতে পানিও খুব কম ছিল।

নদীতে একটি পুল রয়েছে। তার পূর্বাংশে জর্দানের শেষ চৌকি এবং বড় একটি প্রতিরক্ষা মোর্চা রয়েছে। পুলের প্রায় দুই–তৃতীয়াংশ জর্দানের কব্জায়। আর অবশিষ্টাংশ ইসরাঈলের দখলে। উভয় অংশকে পৃথক করার জন্য মাঝখানে বড় একটি ড্রাম রয়েছে। আমরা সেই ড্রাম পর্যন্ত যাই। এর সম্মুখে ইসরাঈলের সৈন্য পাহারা দিচ্ছিল। পুলের পশ্চিম প্রান্তে তাদের চৌকি দেখা যাচ্ছিল। বায়তুল মুকাদ্দাস এখান থেকে বার পনের মাইলের অধিক নয়। কিন্তু বায়তুল মুকাদ্দাস তো দূরের কথা আমাদের জন্য ইসরাঈলের করুণাপাশে আবদ্ধ না হয়ে এ নদী অতিক্রম করাও সম্ভব ছিল না। পশ্চিম তীরে ইসরাঈলের উড়ন্ত পতাকারূপে আমাদের পাপের ফল আমাদের সম্মুখে বিরাজ করছিল। আমাদের অন্তর অনুতাপ, অনুশোচনা, হতাশা ও অস্থিরতার উন্মত্ত আবেগে নিষ্পেষিত হচ্ছিল। কিন্তু আমাদের নিকট নিজেদের অসহায়ত্বের জন্য বিলাপ করা ছাড়া এ অবস্থার অন্য কোন প্রতিকার ছিল না। সকল সঙ্গী মূক ও বিমূঢ় ছিল। কেউ কারো সাথে কথা বলছিল না। হয়ত সকলেই এরূপ আবেগে নিমজ্জিত ছিল। ফিরে এসে গাড়ীতে বসার সময় আমাদের এক সঙ্গী নীরবতা ভেঙ্গে বললেন ঃ "এ জায়গায় পর্যটনের জন্য নয়, বরং জেহাদের জন্য আসা প্রয়োজন ছিল।" আমরা এ আঘাতও সয়ে গেলাম এবং আমাদের গাড়ী অল্প সময়ের মধ্যেই পূর্ব দিকে ফিরতি পথ ধরে চলতে লাগল।

এখান থেকে আমাদের কাফেলা মসজিদে আবু উবাইদার দিকে যাত্রা

করে। পথিমধ্যেই জুমুআর ওয়াক্ত হয়ে যায়। অধিকাংশ আরব দেশগুলোতে সূর্য ঢলতেই প্রথম ওয়াক্তে জুমুআ পড়ে নেওয়ার অভ্যাস। সকল মসজিদে একই সময়ে জুমুআ হয়। তাই এক মসজিদে জুমুআ না পেলে আর কোথাও পাওয়া যায় না। বিধায় পথের একটি শহরে আমরা জুমুআর নামায আদায় করি। নামাযান্তে মসজিদে আবু উবাইদাতে পৌঁছি। ব্যবস্থাপকগণ সেখান থেকে নিকটবর্তী একটি গ্রামে আমাদেরকে নিয়ে যায়। সেখানে এক জমিদার বাড়ীতে দুপুরের খাবারের আয়োজন ছিল। খাবারগুলো জর্দানের স্থানীয় ঐতিহ্যের ধারায় বিন্যাস করা হয়েছিল। কয়েকটি বড় বড় প্লেটে পোলাও দেওয়া হয়েছে। তার মধ্যে আগে থেকেই দই এবং চালগুজা (ফলবিশেষ যা বিরিয়ানীতে ব্যবহৃত হয়) দেওয়া ছিল। প্লেটের মাঝে একটি আস্ত দুম্বা ভুনা করে রাখা ছিল। জর্দানে গ্রামাঞ্চলের রীতি এই যে, বিশিষ্ট মেহমানদের জন্য এই খাবার পেশ করা হয়। চামচ, ছুরি ও কাঁটার লৌকিকতা ছিল না। দশ বারোজন করে এক এক প্লেটে বসে হাতে হাতে খাবার খেয়ে নিই।

আহারান্তে আম্মান ফেরার জন্য অন্য পথ ধরা হয়। পথটি অত্যন্ত সবুজ শ্যামল এবং পাহাড়ের মধ্য দিয়ে অতিক্রম করে। কদমে কদমে ক্ষেত ও উদ্যান, সবুজ শ্যামলে ভরা পাহাড়, মনোরম উপত্যকা এবং পাহাড়ের চড়াই উৎরাই অতিক্রমকারী পথ। মোটকথা সারাটি পথ বড় নয়নাভিরাম এবং চিত্তাকর্ষক ছিল। পথিমধ্যে 'আর রব্‌জ' নামক একটি দুর্গও দেখলাম। দুর্গটি এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ পাহাড়ের চূড়ায় সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী নির্মাণ করেছিলেন। এটি সেই সময়ের ঘটনা। যখন বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর খৃষ্টানরা দখল বিস্তার করেছিল। আর সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী খৃষ্টানদের হাত থেকে তা মুক্ত করার জন্য দাঁড়িয়েছিলেন। এই দুর্গ এ অঞ্চলের সর্বোচ্চ স্থান। এর মুখ পশ্চিম দিকে। এখানকার পাহাড় থেকে অনেক দূর পর্যন্ত ফিলিস্তিন অবলোকন করা যায়। নিঃসন্দেহে এখানে বসানো মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ) পশ্চিমে শত্রুপক্ষের উপর আক্রমণের জন্য অত্যন্ত কার্যকর প্রমাণিত হতো। আজ এই দুর্গ পুনরায় আরেক সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর প্রতীক্ষায় পথ চেয়ে আছে।

আসরের সময় হয়ে গিয়েছিল। পথের এক গ্রামের মসজিদে নামায আদায় করলাম। গ্রামটির নাম 'আজলুন'। প্রসিদ্ধ হাদীস গ্রন্থ 'কাশফুল খফা' এর প্রণেতা আল্লামা ইসমাইল বিন মুহাম্মদ আজলুনী (রহঃ)এর নাম এই গ্রামের দিকেই সম্পৃক্ত। যেই মসজিদে আমরা আসর নামায পড়ি সেটিও অত্যন্ত প্রাচীন মসজিদ। মসজিদে লাগানো একটি ফলকের উদ্ধৃতি দিয়ে ডঃ আবদুস সালাম আজদী বলেন ঃ 'মসজিদটি সুলতান জাহের বিবরূছ নির্মাণ করেন।'

এখান থেকে যাত্রা করে মাগরিবের সময় আমরা আম্মান ফিরে যাই।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

জর্দান ছোট একটি দেশ। জর্দানের যেসব অঞ্চল ইসরাঈল কব্জা করেছে তা সহ এর মোট আয়তন ১ লাখ ৮ হাজার বর্গকিলোমিটার। আরব ইসরাঈলের যুদ্ধের পর ৯৭ হাজার ৭ শত ৪০ বর্গকিলোমিটার অবশিষ্ট রয়েছে। জনবসতি প্রায় বার লক্ষ। বেশীর ভাগ ভূমি শুষ্ক ও অনাবাদী। তবে কোন কোন অঞ্চল খুবই উর্বর। খাদ্যশস্য এবং যাইতুন এখানকার বিশেষ উৎপন্ন দ্রব্য। ফসফরাসও বের হয়। তুর্কি খেলাফতকালে এটি ইসলামী হুকুমাতের ছোট একটি শূবা বরং একটি বিভাগ ছিল। জর্দান, সিরিয়া, লেবানন এবং ফিলিস্তীন যা বর্তমানে চারটি স্বাধীন রাষ্ট্র, এই চার রাষ্ট্রকে একত্রে শাম বলা হত। যা ইসলামী হুকুমাতের একটি শুবা ছিল। পাশ্চাত্য দেশসমূহের চক্রান্তের ফলে শাম চারখণ্ডে বিভক্ত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর জর্দান তুর্কি খেলাফত থেকে ভিন্ন হয়ে যায়। ১৯৪৬ সালে বর্তমান রাজ পরিবার 'আল মামলাকাতুল হাশিমিয়্যাহ আল উর্দুনিয়্যাহ' নামে তাদের রাজত্ব প্রতিষ্ঠা করে।

রাষ্ট্রের নিয়ম শৃংখলা এবং ব্যবস্থাপনার দিক থেকে বর্তমানে জর্দান মুসলিম বিশ্বের সেই কয়টি দেশের অন্যতম, যেগুলোর আইন শৃংখলা এবং জীবন যাত্রার মান প্রশংসনীয়। দেশটিকে এই পর্যায়ে উপনীত করতে শাসকদের প্রচেষ্টার উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। এখানে শিক্ষিতের হার ৮০ শতাংশ। এখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শিক্ষা,

আদব–আখলাকের অনুসরণ সুস্পষ্ট। পরিচ্ছন্নতার মানও মুসলিম বিশ্বের অন্যান্য অনুন্নত বা উন্নয়নশীল দেশসমূহ থেকে উৎকৃষ্ট। লোকেরা বলে যে, বাদশাহ হুসাইন এবং যুবরাজ শাহজাদা হাসান অত্যন্ত সাদাসিধেভাবে মানুষের সঙ্গে মিশে থাকেন। সড়ক দিয়ে যেতে কাউকে কোন অন্যায় কাজ করতে দেখলে নিজে গাড়ী থেকে নেমে বিনম্রভাবে বুঝিয়ে দেন।

জনসাধারণের পক্ষ থেকে সরকারী অফিসগুলোর ব্যাপারে ঘুষ, অনিয়ম বা কাজে ফাঁকি দেওয়ার বিষয়ে কোন অভিযোগ নেই। যে কোন ব্যক্তি তার বৈধ কোন কাজ নিয়ে অফিসে গেলে অনায়াসে সে নিজের উদ্দেশ্য পুরা করতে পারে। অপরাধও খুব কম সংঘটিত হয়। মোটের উপর সেখানে শান্তি ও নিরাপত্তার পরিবেশ দৃষ্টিগোচর হয়।

মানুষের মধ্যে সদাচরণ ও বিনম্র চরিত্র এত ব্যাপক যে, যে কারো সঙ্গে কথা বললে অন্তর খুশী হয়ে যায়। মানুষের মধ্যে সদাচরণের এই উঁচু মান অন্য কোন আরব দেশে অধমের দৃষ্টিগোচর হয়নি। কোন অপরিচিত লোক পথ চলতে চলতে কোথাও থেমে গেলে, প্রত্যেক পথিক যাত্রা বন্ধ করে তার কোন সাহায্যের প্রয়োজন আছে কিনা সে বিষয়ে জিজ্ঞেস করে।

জনসাধারণের ধর্মীয় অবস্থা খুব ভাল না হলেও খুব মন্দও না। মসজিদে নামাযীর সংখ্যা যথেষ্ট। ধোঁকা, প্রতারণা খুব কম। তবে জর্দানের উপর আমেরিকার প্রভাব ক্রমবর্ধমান। যে কারণে ধর্মীয় পরিবেশও দিন দিন খারাপ হতে চলেছে। প্রচার মাধ্যমগুলোর নগ্নতা ও অশ্লীলতার উপর কোন প্রতিবন্ধকতা নেই। অত্যন্ত বিবস্ত্র ও চরিত্র বিধ্বংসী ফিল্মের প্রদর্শনী টিভির প্রাত্যহিক কর্মসূচীর অন্তর্ভুক্ত। এ কারণে সমাজ দ্রুত নৈতিক অবক্ষয়ের দিকে ধাবিত হচ্ছে। নগ্নতা অশ্লীলতা ও মদপান করার মহামারী এখনও জনসাধারণ পর্যন্ত পৌঁছেনি। তবে দেশের প্রভাবশালী শিক্ষিত এবং ধনী মহলে দ্রুত ছড়িয়ে পড়ছে।

জর্দান তার জনবসতি এবং আভ্যন্তরীণ সমস্যার স্বল্পতার কারণে শরীয়তের অনুশাসন বাস্তবায়ন করার জন্য উৎকৃষ্টতম একটি দেশ। জর্দান শরীয়তের অনুশাসন মেনে চলার দৃষ্টান্ত প্রতিষ্ঠা করলে সমগ্র বিশ্বের

জন্য একটি আদর্শ রাষ্ট্রে পরিণত হবে। কিন্তু শাসকদেরও এদিকে মনোযোগ নেই এবং এ উদ্দেশ্য বাস্তবায়নের জন্য প্রভাবশালী কোন আন্দোলনও দেশে বিদ্যমান নেই। ফলে এখানে আমেরিকান প্রভাব দিন দিন বেড়ে চলছে এবং এতে বাধা দেওয়ার কোন পথও নেই।

সিরিয়ার অভ্যন্তরে

বিচ্ছিন্ন এই আলোচনার পর ১৯৮৬ সালের জানুয়ারী মাসের ভ্রমণের আলোচনায় পুনরায় ফিরে আসছি।

রমছা ছিল জর্দানের শেষ গ্রাম। সেখানে ইমিগ্রেশন ও অন্যান্য কাজ শেষ করে আমরা সম্মুখে অগ্রসর হতে চাচ্ছিলাম। কিন্তু জানতে পারলাম যে, সিরিয়ার সীমান্তে প্রবেশ করার জন্য সিরিয়া সরকারের পক্ষ থেকে পথনির্দেশক একটি গাড়ী আসে। একমাত্র তার পথ প্রদর্শনেই সীমান্ত অতিক্রম করা যাবে। একা কোন গাড়ী যাওয়ার অনুমতি নেই।

সুতরাং সেই গাড়ীর প্রতীক্ষায় অনেক দেরী হয়ে যায়। কয়েকটি গাড়ী একত্রিত হলে সিরিয়ার গাড়ী এল এবং তার পথ প্রদর্শনে আমাদের গাড়ী চলতে আরম্ভ করলো। রমছার চৌকি থেকে বের হয়ে সিরিয়ার সীমান্ত চৌকি দারআ পর্যন্ত পৌছতে প্রায় দুই কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করতে হয়। এখানে সড়কের উভয় দিকে রেলিং দেওয়া আছে। এত গাঢ় অন্ধকার ছিল যে, রেলিংয়ের ওপারে কিছু দেখা যাচ্ছিল না। শুধুমাত্র সামনের পথ প্রদর্শক গাড়ীর পিছনের আলোর পিছে পিছে চলতে থাকি। অবশেষে সিরিয়ার প্রথম চৌকি দারআ এসে যায়। এখানে ইমিগ্রেশন এবং কাষ্টমের কাজ শেষ হতে অনেক দেরী হয়ে যায়। আমার সাথে কিতাবের একটি বাণ্ডিল ছিল। এ সকল কিতাব সৌদী আরব এবং জর্দান থেকে ক্রয় করেছিলাম। গাড়ী থামতেই কাষ্টমের এক ব্যক্তি কিতাবের সেই বাণ্ডিল তুলে নিয়ে ভিড়ের মধ্যে হারিয়ে যায়। কাষ্টমের আরো কিছু লোক পরে গাড়ীর অন্যান্য সামানা তল্লাশী করল এবং গাড়ী ছেড়ে দিল। তাদের কাছেই কিতাবের খোঁজ নিতে চাইলাম। তখন তারা একটি অফিসের ঠিকানা বলে দিল যে, সেখানে কিতাবসমূহের তল্লাশী হবে। তারপর তা আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়া হবে।

রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। তখনও এশার নামায পড়িনি। ইমিগ্রেশনের কাজ শেষ হওয়ার পর প্রথমে আমরা নামায পড়ি। তারপর কিতাবের তালাশে অনেকক্ষণ ঘোরাঘুরি করতে থাকি। অবশেষে অনেক খোঁজাখুঁজির পর কিতাবের বাণ্ডিল পেয়ে যাই। এখান থেকে আমাদেরকে দিমাশ্‌ক যেতে হবে। দিমাশ্‌ক এখান থেকে প্রায় একশ' কিলোমিটার দূরে। তাই রাত্রির খাবারের পরিবর্তে অল্প একটু নাস্তা করলাম। যখন এখান থেকে রওনা করি তখন রাত্রি এগারোটা বেজে গেছে।

দারআ অতিক্রম করার পর দিমাশ্‌কগামী সড়কে নিবিড় অন্ধকারের মধ্য দিয়ে চলতে থাকি। যখনই কোন মোড় আসত, তখনই পথ জেনে নিতে হত। সকাল আটটা থেকে আমরা একাধারে গাড়ীতে সফর করছিলাম। এজন্য অতি তাড়াতাড়ি গন্তব্যে পৌঁছার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু পথ শুধু দীর্ঘই হতে থাকে। যেখানেই একটু বেশী আলো দেখতে পেতাম তাকেই দিমাশ্‌ক বলে মনে হত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যেত তা ভিন্ন কোন গ্রাম। তা অতিক্রম করার পর পুনরায় অন্ধকার ছেয়ে যেত। রাস্তা নির্ধারণের জন্য দুই একবার পিছনেও ফিরে যেতে হয়। আল্লাহ আল্লাহ করতে করতে দূর দিগন্তে একটি পাহাড় আলোয় ঝলমল করতে দেখতে পেলাম। তার পাদদেশে অনেক দূর পর্যন্ত বাতি ছড়িয়ে ছিল। এটিই দিমাশ্‌কের প্রসিদ্ধ পাহাড় কাসিয়ূন।

যখন আমরা দিমাশ্‌কের সীমানায় প্রবেশ করি তখন রাত্রি বারোটা। অর্ধরাত্রি চলে যাওয়ার পরও শহরের হৈহুল্লোড় চলছিলই। ক্লান্তি এত বেশী ছিল যে, হোটেল নির্বাচনের জন্য ঘুরে দেখাও সম্ভব ছিল না। আতাউর রহমান সাহেব পূর্বেও দিমাশ্‌ক এসেছিলেন। তিনি বললেন যে, মারজা নামক মহল্লার একটি হোটেলে তিনি ইতিপূর্বে অবস্থান করেছিলেন। সেখানে আরও হোটেল রয়েছে। সুতরাং আমরা সোজা সেখানে চলে যাই। আতাউর রহমান সাহেব যে হোটেলের কথা বলেছিলেন, সেখানে কোন জায়গা খালি ছিল না। তাই মৌলভী আতাউর রহমান সাহেব এবং মৌলভী আমিন আশরাফ সাহেব (সাল্লামাহু) অন্য কোন হোটেলের খোঁজে বের হয়ে যান। আমি এবং ক্বারী বশীর সাহেব হোটেলের লাউঞ্জে বসে থাকি।

তাদের ফিরে আসতে দেরী হলে আমরা তাদের দেখার জন্য বাহিরে বের হই। কিছুদূর গিয়ে ভয়ঙ্কর ও বিস্ময়কর দৃশ্য সামনে আসে। সড়কের ধারে কিছু লোক ছোট ছোট টেবিল লাগিয়ে দাঁড়িয়েছিল। টেবিলগুলোতে কিছু বোতল সাজানো আছে। লোকগুলো উচ্চস্বরে ডাকছিল ঃ 'হুইস্কি, হুইস্কি, হুইস্কি।'

অপর দিকে নোংরা ধরনের কিছু লোক টেবিলের আশপাশে হাতে মদ নিয়ে হৈচৈ করছিল। মদের এরূপ বেচাকেনা এবং ব্যবহারের এই কুৎসিত দৃশ্য আমি ইতিপূর্বে কমপক্ষে কোন মুসলিম দেশে দেখিনি। অনুমান হলো এ জায়গাটি ভাল লোকদের নয়। এখান থেকে অন্য কোথাও স্থানান্তর হওয়া দরকার। ইতিমধ্যে আতাউর রহমান সাহেব এবং আমিন আশরাফ সাহেব খবর নিয়ে আসে যে, আশেপাশের সব ভাল হোটেল ভরে গেছে এবং অধিকাংশ হোটেল ইরানী পর্যটকরা বুক করে রেখেছে। শুধুমাত্র একটি নতুন হোটেলে একটি কক্ষ খালি রয়েছে। এ অঞ্চলের প্রতি যে ঘৃণার সৃষ্টি হয়েছে, তার দাবী ছিল যে, আমরা এখান থেকে অন্য কোন মহল্লায় গিয়ে ভাল পরিবেশ খুঁজে নেই। কিন্তু রাত্রি দেড়টা বেজে গেছে। বিছানায় যাওয়ার এক প্রবল চাহিদা আমাদের মধ্যে ছিল তাই কমপক্ষে একরাতের জন্য আমরা ঐ কক্ষেই থাকার সিদ্ধান্ত নেই। প্রচণ্ড ক্লান্তির পর বিছানা পাওয়ায় খুব তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যায়।

প্রত্যুষে জেগে কার্যাদি শেষ করে আমি পাকিস্তানী দূতাবাসে টেলিফোন করি। কাউন্সিল জেনারেল তাওহীদ আহমাদ সাহেবের সঙ্গে কথা হল, তিনি দূর থেকে আমার সম্পর্কে অবগত ছিলেন। আমি তাকে বললাম যে, আমাদের অবস্থানের জন্য ভাল একটি হোটেলও দরকার এবং ভাল একজন পথপ্রদর্শকেরও প্রয়োজন। তিনি বললেন, এক ঘন্টার ভিতর আমি নিজে এসে যাব। সুতরাং তিনি ওয়াদা মোতাবেক এক ঘন্টার মধ্যে আমাদের নিকট চলে আসেন। ইতিমধ্যে তিনি ভাল একটি হোটেলেও আমাদের জন্য সিট বুকিং করান। এটি ছিল একটি ফোর ষ্টার হোটেল, 'ফিন্দাক আল বুস্তান'। হোটেলটি দিমাশ্‌কের জাকজমকপূর্ণ ভিক্টোরিয়া অঞ্চলে কাসিয়ুন পাহাড়ের সম্মুখে অবস্থিত, যা ছিল আমাদের প্রয়োজন পূরণের জন্য খুব উপযুক্ত। সুতরাং আমরা সেখানে চলে যাই।

দিমাশ্‌ক বিশ্ববিদ্যালয়ে

ইতিমধ্যে তাওহীদ সাহেব আমাদেরকে দিমাশ্‌ক বিশ্ববিদ্যালয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রোগ্রাম করেছিলেন। সুতরাং আমরা হোটেল থেকে সোজা দিমাশ্‌ক বিশ্ববিদ্যালয়ে যাই। এখানে 'কুল্লিয়্যা আশ্‌ শারীয়া' এর প্রধান ডঃ ফাতহী আদ্‌দারিনী আমাদের প্রতীক্ষায় ছিলেন। আমি দারিনী সাহেবকে দূর থেকে তার লিখিত গ্রন্থসমূহের মাধ্যমে চিনতাম। তিনি উসূলে ফিকাহ এবং ফিকাহ সংক্রান্ত আধুনিক বহু মাসয়ালা সম্বলিত গবেষণামূলক অনেকগুলো গ্রন্থ রচনা করেছেন। তার একটি গ্রন্থ 'আল মানাহিজুল উসুলিয়্যা' আমার নিকট পূর্ব থেকেই ছিল। তাওহীদ সাহেব তার সঙ্গে আমার পরিচয় করে দেন। তিনি অত্যন্ত উষ্ণতার সাথে আমাদের সঙ্গে মিলিত হন এবং কুল্লিয়্যা আশ্‌ শারীয়্যার অন্যান্য প্রফেসরদেরকেও একত্রিত করেন। এখানে দীর্ঘ সময় জ্ঞান শীর্ষক বিভিন্ন বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে। ডঃ দারিনী সাহেব তার রচিত গ্রন্থসমূহের একটি সেটও অধমকে উপহার দেন।

দিমাশ্‌ক বিশ্ববিদ্যালয়ের কুল্লিয়্যা আশ্‌ শারীয়াকে আরব বিশ্বে জ্ঞান ও গবেষণার মানের দিক থেকে উচ্চাসনের অধিকারী মনে করা হয় এবং সম্ভবতঃ আল-আজহার বিশ্ববিদ্যালয় এবং আয্‌ যাইতুনা বিশ্ববিদ্যালয়ের পর জ্ঞানগত প্রসিদ্ধি তারই সর্বাধিক ছিল। কিন্তু বর্তমান ধর্মহীন সরকার এখানকার আলেম-ফাজেলদের উপর অসহনীয় নির্যাতন চালানোর কারণে এখান থেকে বড় বড় আলেম ফাযেল হিজরত করে চলে গেছেন। ফলে তার পূর্বের সেই জ্ঞানগত মানও অবশিষ্ট নেই এবং দ্বীনী আমলের দিক থেকে এখানকার পরিবেশ আরও বেশী অধঃপতনে চলে গেছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ে সহশিক্ষা পদ্ধতি চালু রয়েছে। তবে এতদসত্ত্বেও অনেক ছাত্রীকে পূর্ণ বোরখা পরিহিত দেখতে পেলাম।

দুপুরে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। আসর পর্যন্ত বিশ্রাম করি। তাওহীদ সাহেব দূতাবাসের সেকেণ্ড সেক্রেটারী এনায়েত সাহেবকে আমাদের পথপ্রদর্শনের জন্যে নির্ধারণ করে দিয়েছিলেন। আসর নামাযের সময় তিনি হোটেলে চলে আসেন এবং তার সঙ্গে আমরা দিমাশ্‌কের বিভিন্ন স্থান দেখার জন্য রওয়ানা হই।

দিমাশ্‌ক নগরী

দিমাশ্‌ক বর্তমান বিশ্বের প্রাচীনতম শহরগুলোর অন্যতম। কোন কোন বর্ণনা থেকে জানা যায় যে, হযরত নূহ (আঃ) প্লাবনের পর কিশতী থেকে অবতরণ করে সর্বপ্রথম দুটি বসতি আবাদ করেন। প্রথমে হাররান এবং পরে দিমাশ্‌ক আবাদ করেন। এভাবে নূহ (আঃ)এর প্লাবনের পর সর্বপ্রথম হাররান এবং দিমাশ্‌ক নগরী আবাদ হয়। অন্য কিছু বর্ণনায় আছে যে, হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর একজন ক্রীতদাসের নাম ছিল দিমাশ্‌ক। সেই সর্বপ্রথম এখানে বসতি স্থাপন করে। তাই এর নাম হয় দিমাশ্‌ক। কোন কোন ইতিহাসে উল্লেখ আছে যে, এই বসতি যুলকারনাইন আবাদ করেছিলেন। কেউ কেউ সেকান্দার মাকদূন এর একজন ক্রীতদাসকে এর নির্মাতা বলেছেন।

বিরোধপূর্ণ এসব ঐতিহাসিক বর্ণনার ভিত্তিতে কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া দুস্কর। তবে এতে কোন সন্দেহ নাই যে, শহরটি শত–সহস্র বছর পূর্বে আবাদ হয়েছে। বাইবেলের পুরাতন নিয়মেও এর উল্লেখ আছে। যখন থেকে ইতিহাস সংকলন শুরু হয়েছে, তখন থেকে এর এ নামই চলে আসছে। এজন্যই বলা হয় যে, দিমাশ্‌ক পৃথিবীর সর্বপ্রাচীন শহর যা আজও আবাদ রয়েছে। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে অসংখ্য শক্তি এই শহর শাসন করেছে। ইসলাম উদয়ের সময় এটি রোমের বাইজেন্টাইন রাজত্বের গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক শহর ছিল। হযরত উমর (রাযিঃ)এর খিলাফতকালে হযরত আবু উবাইদা বিন জাররাহ (রাযিঃ)এর নেতৃত্বে এটি বিজয় হয় এবং শাম–শূবার রাজধানী সাব্যস্ত হয়। হযরত উমর (রাযিঃ)এর শাসনকালেই হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)এর গভর্নর নিযুক্ত হন। হযরত আলী (রাযিঃ)এর শাহাদতের পর তিনি এটিকে পুরো আলমে ইসলামের দারুল খিলাফত বানান। সুতরাং বনু উমাইয়ার শাসনকালে প্রায় এক শতাব্দী পর্যন্ত এটি সেই ইসলামী সাম্রাজ্যের রাজধানী ছিল, যার সীমানা আটলান্টিক মহাসাগর থেকে ভারত মহাসাগর পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

প্রায় এক লাখ আম্বিয়ায়ে কেরামের (আঃ) সম্মানিত পিতামহ হযরত ইবরাহীম (আঃ) সিরিয়াকেই তাঁর দারুল হিজরতরূপে গ্রহণ

করেন। ফলে যেসব নবীদের জীবন সম্পর্কে জানা যায় তাঁদের বেশীর ভাগই সিরিয়াতে জন্মগ্রহণ করেন এবং দিমাশ্‌ক নগরীর কাসিয়ূন পাহাড় তাঁদের ধর্মপ্রচারের বিরাট বড় কেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে।

মুসলমানদের হাতে দিমাশ্‌ক বিজয় হওয়ার পর বিরাট সংখ্যক গুরুত্বপূর্ণ সাহাবী এখানে এসে বসতি স্থাপন করেন। বিধায় এই শহরকে আম্বিয়া (আঃ) এবং সাহাবায়ে কেরামের শহর বললে অসঙ্গত হবে না। আর এ কারণেই এ শহরের কোণায় কোণায় ইসলামী ইতিহাসের অসংখ্য স্মৃতি বিজড়িত রয়েছে।

এই নগরী সমুদ্রপৃষ্ঠ থেকে দু' হাজার দুই শত ফুট উঁচুতে অবস্থিত। ফলে এখানকার ঋতু ও জলবায়ু অত্যন্ত মনোরম। শীতকালে তুষারপাতও হয় এবং প্রচণ্ড গরমের রাত্রিও ঠাণ্ডা এবং আনন্দাদায়ক। বুরদা নদী নগরীর নিকট দিয়ে প্রবাহিত হয়েছে। এর পানি দ্বারা শহরবাসী শুধু পরিতৃপ্তই হয় না বরং এর কারণেই অঞ্চলটি খুবই সবুজ শ্যামল।

'গুতা' অঞ্চলে

দেমাশ্‌কের বিভিন্ন অঞ্চল ঘুরে দেখার সুবিধার্থে এনায়েত সাহেব যে প্রোগ্রাম সেট করেছেন, সে প্রোগ্রামানুসারে তিনি সর্বপ্রথম আমাদেরকে 'গুতা' নিয়ে যান। 'গুতা' দিমাশ্‌কের শহরতলী হওয়া সত্ত্বেও প্রাচীন কাল থেকেই তার উর্বরতা, সৌন্দর্য ও চিত্তাকর্ষণের কারণে সমগ্র বিশ্বে প্রসিদ্ধ। যেমন প্রসিদ্ধ ভূগোল বিশারদ আল্লাম হামভী (রহঃ) লেখেন—

"আল্লাহ পাকের সৃষ্ট শহরগুলোর মধ্যে এ অঞ্চলটি সর্বসম্মতিতে সর্বাধিক পবিত্র এবং সুদৃশ্য। এটি সেই চার অঞ্চলের অন্যতম যেগুলোকে ভূস্বর্গ বলা হয়, ঐ চার অঞ্চল হলো—সুগাদ, উবাল্লা, শুয়াবে বাওয়ান এবং গুতা।"

কোন এক কালে এ অঞ্চল বাগান, পাহাড়, নদী এবং ঝর্ণা দ্বারা পরিপূর্ণরূপে সজ্জিত ছিল এবং এ কারণেই একে বিশ্বের সুন্দরতম ভূখণ্ড সাব্যস্ত করা হয়। এখনো এখানে ডুমুর এবং যাইতুনের সুন্দর সুন্দর বাগান রয়েছে। কিন্তু প্রথমতঃ শীতের মওসুম হওয়ায় বাগানসমূহে পাতা ঝরানোর বিষাদময় দৃশ্যের দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। দ্বিতীয়তঃ বর্তমানে এ

অঞ্চলের সজীবতা পূর্বের ন্যায় আর অবশিষ্ট নেই। ফলে কিতাবে 'গুতা' সম্পর্কে যা পড়েছিলাম এবং তাতে মস্তিষ্কে যে ধারণা সৃষ্টি হয়েছিল, এ অঞ্চলকে তা থেকে অনেক ভিন্ন রূপে দেখলাম। এ অঞ্চল সবুজ শ্যামল ঠিকই, কিন্তু বর্তমানে বিশ্বের স্থানসমূহের মধ্যে সম্ভবতঃ এটি উল্লেখযোগ্য কোন নম্বর পাবে না। বিশ্বের পরিবর্তন ও বিবর্তনের অবস্থা এমনই যে, এখানে কোন বস্তুর জাঁকজমক সর্বদা টিকে থাকে না। তারুণ্যের পরিণতি বার্ধক্য এবং অস্তিত্বের পরিণতি বিলীন এখানকার চির সত্য নীতি।

'গুতা' হয়ে এনায়েত সাহেব আমাদেরকে হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর সহোদরা সায়্যিদা যয়নাব বিনতে আলী (রাযিঃ)এর মাযারে নিয়ে যান।

হযরত যয়নাব বিনতে আলী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নাতনী। হযরত আলী (রাযিঃ) এবং হযরত ফাতেমা (রাযিঃ)এর মেয়ে এবং হযরত হাসান হুসাইন (রাযিঃ)এর সহোদরা বোন। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশায় জন্মগ্রহণ করেন। কিন্তু তখন খুব কম বয়সের ছিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) তাঁকে স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফর (রাযিঃ)এর সঙ্গে বিবাহ দেন। কারবালার ঘটনার সময় তিনি তাঁর ভাই হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর সঙ্গে ছিলেন। হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর শাহাদাতের পর তাঁকে অন্যান্য আহলে বাইতের সঙ্গে দিমাশ্‌ক নিয়ে আসা হয়। তিনি সমসাময়িক কালের অত্যন্ত বুদ্ধিমতী এবং সুসাহিত্যিক নারীরূপে প্রসিদ্ধ ছিলেন। হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর শাহাদাতের ঘটনায় তাঁর যে মর্মপীড়া হয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। শরীয়তের সীমারেখায় থেকে সেই বেদনার বহিঃপ্রকাশও তাঁর থেকে ঘটেছে। কিন্তু যেসব বর্ণনায় তাঁর অস্বাভাবিক বিলাপের কথা বর্ণনা করা হয়েছে, তা সনদহীন এবং অযৌক্তিকও। উভয় জাহানের সর্দার হুযূর এর নাতনী তাঁর সাথে সম্পৃক্ত এরূপ বিলাপ ও শোক থেকে নিঃসন্দেহে অনেক ঊর্ধ্বে ছিলেন।

হযরত যয়নাব (রাযিঃ)এর একটি মাযার মিসরেও প্রসিদ্ধ রয়েছে। কিন্তু নির্ভরযোগ্য কোন বর্ণনা দ্বারা তাঁর মিসর যাওয়ার কথা প্রমাণিত হয় না। আর কারবালার ঘটনার পর দিমাশ্‌কে আসা অবশ্য প্রমাণিত

রয়েছে। তাই দিমাশ্‌কে তাঁর সমাধিস্থ হওয়া মিসরে সমাধিস্থ হওয়ার তুলনায় অধিক যুক্তিযুক্ত। যদিও কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, ইয়াজীদ তাঁকে এবং অন্যান্য আহলে বাইতকে পরিপূর্ণ মর্যাদা এবং সম্মানের সঙ্গে পবিত্র মদীনায় পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। যার উত্তরে হযরত যয়নাব (রাযিঃ) এবং হযরত ছকীনা (রাযিঃ) তাদের কিছু গহনা ইয়াজীদের নিকট পাঠিয়ে দেন। কিন্তু ইয়াজীদ একথা বলে তা গ্রহণ করতে অস্বীকার করে যে, আমি আপনাদের সঙ্গে যে আচরণ করেছি তা ইহকালীন কোন লালসার কারণে করিনি, বরং আপনাদের সঙ্গে আত্মীয়তার কারণে করেছি। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

ইরাকের আহলে বাইতের মাযারসমূহের মত হযরত যয়নাবের এই মাযারও অত্যন্ত জাঁকজমকপূর্ণ একটি ভবনে অবস্থিত। যার মিনার ইত্যাদির নির্মাণ পদ্ধতি ইরাকের মাযারগুলোর সঙ্গে সাদৃশ্যপূর্ণ। আমরা যখন কবরে হাযির হই, তখন সেখানে শিয়া মতাবলম্বী যিয়ারতকারীদের শোকগাঁথা কান্নাকাটি ও বিলাপের এক হৈচৈ চলছিল। ফলে কোন আওয়াজ শোনা যাচ্ছিল না। মাযারের নিকটে যাওয়াও কঠিন ছিল। সবচেয়ে বড় মুশকিল এই যে, মাযারে প্রবেশ করা মাত্রই সালাম পড়ানেওয়ালা মুয়াল্লিমদের এক অন্তহীন ধারা দৃষ্টিগোচর হয়। তারা প্রত্যেক পদক্ষেপে তাদের সেবা (পারিশ্রমিকের বিনিময়ে) পেশ করছিল। তাদের নিকট ওজর পেশ করা এক স্বতন্ত্র কাজ ছিল। যা সেখান থেকে ফেরা পর্যন্ত অব্যাহত থাকে। আল্লাহ তাআলা আহলে বাইত হযরাতদের (রাযিঃ) আত্মাসমূহের উপর চিরকাল রহমত নাযিল করুন। তাঁদের ভালবাসার দাবীদারদের পক্ষ থেকে তাঁদের মৃত্যুর পরেও সেসব পুণ্যাত্মাদেরকে কষ্ট দেওয়ার ধারা অব্যাহত রয়েছে। জানিনা কবে পর্যন্ত তা চলতে থাকবে?

আল বাবুস্‌ সগীর কবরস্থানে

এনায়েত সাহেব এখান থেকে আমাদেরকে দিমাশ্‌কের প্রাচীন কবরস্থানে নিয়ে যান। একে আল্‌ বাবুস্‌ সগীর কবরস্থান বলা হয়। এতে অসংখ্য সাহাবী, তাবেঈন এবং বুযুর্গানে দ্বীনের মাযার রয়েছে। বলা হয়

যে, মুসলমানগণ যখন দিমাশ্‌ক বিজয় করেন তখন তাঁরা এই দরজা দিয়েই শহরে প্রবেশ করেন। এখানে অনেকে শহীদ হন। তাঁদেরকে এখানেই দাফন করা হয়। এ স্থানকেই পরে সাধারণ কবরস্থানের রূপ দেওয়া হয়। এই জায়গার নাম পূর্বে 'বাবে তাওমা' ছিল। পরবর্তীতে তাকে 'আল্ বাবুস সগীর' বা 'জাহেরে দিমাশ্‌ক' নামে স্মরণ করা হতে থাকে।

যেসব সাহাবীদের মাযার এই কবরস্থানে আছে বলে বর্ণনা করা হয়, তাঁদের তালিকা অনেক দীর্ঘ, তবে যেসব হযরতের মাযারে সালাম পেশ করার তাওফীক হয়, তাদের সংক্ষিপ্ত আলোচনা পেশ করা যথার্থ হবে।

হযরত বেলাল হাবশী (রাযিঃ)

সর্বপ্রথম আমরা হযরত বেলাল হাবশী (রাযিঃ)এর মাযারে হাজির হই।

হযরত বেলাল হাবশী (রাযিঃ) এবং ইসলামের জন্য তাঁর অবদানসমূহ সর্বজনবিদিত। এমন মুসলমান খুব কমই রয়েছে, যে হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর সম্মানিত নাম উচ্চারিত হতেই ভক্তি ও ভালবাসার স্নিগ্ধতা তার হৃদয়ে অনুভব করে না। ইসলামের আবির্ভাবের পূর্বে পবিত্র মক্কায় তিনি দাসত্বের জীবন অতিবাহিত করেন। উভয় জাহানের সর্দার হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নবুওয়ত প্রাপ্তির পর যাঁরা সর্বপ্রথম ঈমান আনেন হযরত বেলাল (রাযিঃ) তাদের অন্যতম। এমনকি যখন হযরত আমর ইবনে আবাছা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পরিচিতি লাভের জন্য তাঁকে জিজ্ঞাসা করেন ঃ (তাওহীদের) এই পয়গামে আপনার সঙ্গে আর কে আছে? হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন উত্তরে বলেন ঃ حر وعبد অর্থাৎ একজন স্বাধীন আরেকজন ক্রীতদাস। স্বাধীন ব্যক্তি দ্বারা হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এবং ক্রীতদাস দ্বারা হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে বুঝিয়েছেন।

ইসলাম গ্রহণের পর তাঁর মনিব তাঁর উপর জুলুম-অত্যাচারের যে ষ্টিম রোলার চালায়, তার ঘটনাবলী খুবই প্রসিদ্ধ। তাঁকে প্রচণ্ড রোদে

উত্তপ্ত পাথরের উপর শোয়ানো হত এবং লাত ও উজ্জাকে মাবুদ মানতে বাধ্য করা হতো। কিন্তু তাঁর মুখ থেকে 'আহাদ' 'আহাদ' ছাড়া অন্য কোন শব্দ বের হত না। অবশেষে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) তাকে ক্রয় করে আযাদ করে দেন।

তার পর থেকে হযরত বেলাল (রাযিঃ) বাড়িতে এবং সফরে সর্বদা হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে থাকেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিয়মিত মুয়াজ্জিন নিযুক্ত হন। তাঁর উচ্চ মর্যাদার জন্য সেই একটিমাত্র হাদীসই যথেষ্ট। যেখানে বর্ণিত হয়েছে যে, একদিন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ফজর নামাযের পর হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমার সেই আমলের কথা আমাকে বল, যে আমল তোমার নিকট সর্বাধিক আশাপ্রদ। কেননা আমি আজ রাতে জান্নাতের মধ্যে আমার সম্মুখে তোমার পায়ের শব্দ পেয়েছি।' হযরত বেলাল (রাযিঃ) নিবেদন করলেন ঃ 'আমি রাতদিনের যেকোন সময় উযূ করি, তখন আমার প্রভুর জন্য তাওফীক মত অবশ্যই নামায পড়ি।'

পরে এরূপ সময়ও এলো যে, সেই পবিত্র মক্কাতেই যেখানে কালিমা তায়্যিবা পড়ার কারণে হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে নির্যাতন করা হত—যখন মক্কা বিজয় হলো, তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে পবিত্র কাবার ছাদে আরোহণ করে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। সুতরাং তিনি পবিত্র মক্কার কাবাগৃহের ছাদ থেকে সর্বপ্রথম আযান দেন।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর পবিত্র মদীনায় অবস্থান করা সম্ভব হলো না। তিনি জিহাদে অংশগ্রহণের জন্য সিরিয়ায় বসবাস শুরু করেন। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, তিনি হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর খেলাফত কালেই সিরিয়া এসেছিলেন। আর কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, হযরত আবু বকর (রাযিঃ) তাঁকে বাধা দেন। পরে তিনি হযরত উমর (রাযিঃ)এর শাসনকালে সিরিয়া আসেন।

একটি বর্ণনায় আছে যে, সিরিয়ায় থাকাকালে হযরত বেলাল

(রাযিঃ)এর স্বপ্নযোগে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে সাক্ষাত হয়। তিনি স্বপ্নে দেখেন, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বলছেন ঃ 'বেলাল! একি অমানবিক আচরণ! এখনও কি আমার নিকট এসে মিলিত হওয়ার সময় হয়নি।' ঘুম থেকে তিনি জাগ্রত হলেন। তিনি অত্যন্ত চিন্তান্বিত হলেন। সাথে সাথে সোয়ারী প্রস্তুত করালেন এবং পবিত্র মদীনার উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। পবিত্র রওযায় হাজির হয়ে খুব কাঁদলেন। হযরত হাসান হুসাইন (রাযিঃ) সেখানে আসলেন। হযরত বেলাল (রাযিঃ) তাঁদেরকে আলিঙ্গন করলেন। তাঁরা দু'জন হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে বললেন, আপনার আযান শুনতে আমাদের মন চায়। হযরত বেলাল (রাযিঃ) ছাদে দাঁড়িয়ে আযান দিতে শুরু করেন। তাঁর কণ্ঠে আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার ধ্বনিত হওয়ার সাথে সাথে পবিত্র মদীনা গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে। আশহাদু আল্লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ বলার সাথে সাথেই হৈচৈ পড়ে যায়। আর যখন আশহাদু আন্না মুহাম্মাদার রাসূলুল্লাহ বললেন, তখন পর্দানসীন নারীরা পর্যন্ত দিশেহারা অবস্থায় ঘর হতে বের হয়ে আসে। আর বলতে থাকে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পুনরায় প্রেরিত হয়েছেন। বলা হয় যে, ঐ দিনের চেয়ে বেশী অন্য কোন দিন পবিত্র মদীনায় লোকদেরকে কাঁদতে দেখা যায়নি।

উপরোক্ত বর্ণনাটি সনদের দিক থেকে দুর্বল। এর চেয়ে ঐ বর্ণনাটি অধিক মজবুত, যেখানে বলা হয়েছে ঘটনাটি সিরিয়ায় ঘটেছে, অর্থাৎ হযরত উমর (রাযিঃ) যখন সিরিয়ায় আগমন করেন, তখন তিনি হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে আযান দেওয়ার নির্দেশ দেন। তিনি আযান দিলে মানুষেরা কাঁদতে থাকে ; মানুষদেরকে ঐ দিন থেকে অধিক অন্য কোনদিন কাঁদতে দেখা যায়নি।

হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর জীবন চরিত থেকে প্রতীয়মান হয় যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পর তার জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত আখেরাতে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় পূর্ণ ছিল। সুতরাং মৃত্যুর সময় যখন সন্নিকটে তখন তিনি আত্মভোলা অবস্থায় এই কবিতা আবৃত্তি করছিলেন—

غدا نلقى الأحبه محمدا وحزبه

"কাল আমার প্রিয় ব্যক্তিত্বদের সঙ্গে সাক্ষাত হবে, অর্থাৎ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীদের সঙ্গে।"

মৃত্যুর প্রচণ্ড কষ্ট দেখে তাঁর স্ত্রী বললেন—হায় আফসোস।

কিন্তু হযরত বেলাল (রাযিঃ) বললেন—হায় কি আনন্দ।

হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর মাযার সিরিয়ায় তিন জায়গায় বলা হয়। এক, এখানে ; দুই, দারীয়া নামক কসবায় ; তিন, হলবে। কিন্তু বেশীর ভাগ আলেমের মত এদিকে যে, তিনি আল বাবুস সগীরের এই কবরস্থানেই সমাধিস্থ হয়েছেন।

হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর মাযার যিয়ারত কালে অন্তরে এক বিচিত্র অবস্থা বিরাজ করছিল। ফেরেশতাদের ঈর্ষার যোগ্য তাঁর জীবনের ঘটনাবলী স্মরণ হচ্ছিল। উভয় জাহানের সর্দার রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দাসত্ব তাঁকে কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে দিয়েছে। আরবের কুরাইশের সেসব নেতা যাদেরকে সমগ্র আরব উপদ্বীপে মর্যাদার দৃষ্টিতে দেখা হত, যাদের সম্মুখে আরবের অভিজাত বংশসমূহের মস্তক অবনত থাকত, তারা ইসলাম থেকে বিমুখ হওয়ার কারণে লাঞ্ছনা ও বিস্মৃতির গর্তে পতিত হয়েছে। আজ কেউ সম্মানের সাথে তাদের নাম উল্লেখ করাও পছন্দ করে না। অথচ আবিসিনিয়ার এই বাসিন্দা যাঁর জীবন দাসত্বের শৃংখলাবদ্ধ ছিল। যাঁকে কেউ ভালবেসে আলিঙ্গন করতে প্রস্তুত ছিল না। তিনিই সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পদতলে আশ্রয় গ্রহণ করে চির অমর হয়ে রইলেন। এ বিষয়টিই আরবী এক কবিতায় হযরত ওয়ালীদ সাহেব কুদ্দিছা ছিররুহু ব্যক্ত করেছেন—

فداك ابو جهل، اخوالذل والعمى

وان بلالا فاق احرار حميرا –

হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে আল্লাহ পাক যে উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন, তা কল্পনা করতে গিয়ে মরহুম ইকবালের সেই কবিতামালা

স্মৃতিপটে ধ্বনিত হতে থাকে। যেগুলো তিনি হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে সম্বোধন করে অত্যন্ত ভক্তি, শ্রদ্ধা ও ভালবাসা নিয়ে রচনা করেছিলেন—

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ)

হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর মাযারের একদম নিকটে একটি কবরে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ)এর সম্মানিত নামের ফলক বসানো আছে। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দ্বিতীয় মুয়াজ্জিন ছিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যুগে তিনি বেশীর ভাগ ফজরের আযান দিতেন। তিনি মক্কার অধিবাসী এবং উম্মুল মুমিনীন হযরত খাদীজাতুল কুবরা (রাযিঃ)এর মামাতো ভাই ছিলেন। বাল্যকালেই তাঁর চোখ নষ্ট হয়, ফলে তিনি অন্ধ হয়ে যান। যখন হিজরতের ধারা শুরু হলো, তখন তিনি নবী করীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পূর্বেই হিজরত করে পবিত্র মদীনায় বসবাস শুরু করেন। পবিত্র কুরআনের দুটি আয়াত তার ব্যাপারে অবতীর্ণ হয়েছে।

সূরা নিসার ৯৫ নম্বর আয়াতে প্রথমে এরূপ ছিল—

لَا يَسْتَوِى الْقَاعِدُوْنَ مِنَ الْمُهَاجِرِيْنَ - وَالْمُجَاهِدُوْنَ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ -

"যে সব মুহাজির জিহাদে না গিয়ে বসে আছে (অর্থাৎ জিহাদে অংশগ্রহণ করেনি) তাঁরা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদকারীরা সমান হতে পারে না।"

এই আয়াত অবতীর্ণ হলে হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ) চিন্তিত হলেন। কারণ তিনি অন্ধত্বের কারণে জিহাদে অংশগ্রহণ করতে পারছিলেন না। সুতরাং তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট অন্ধত্বের কারণে তাঁর অপারগতার কথা তুলে ধরলেন। তখন এই আয়াতেরই এ টুকরা অবতীর্ণ হয়—

غَيْرُ أُولِى الضَّرَرِ

"তারা ছাড়া যাদের সমস্যা রয়েছে।"

এমনিভাবে সূরা আবাছার প্রথম আয়াতসমূহ তার ব্যাপারেই অবতীর্ণ হয়েছে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম পবিত্র মক্কার সর্দারদেরকে ইসলামের দাওয়াত দিতেছিলেন। এমতাবস্থায় হযরত আবদুল্লাহ ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ) একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করতে আসেন। অন্ধ হওয়ার কারণে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট কারা বসে আছে তা দেখতে না পেয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বারবার সম্বোধন করে প্রশ্ন করতে থাকেন ঃ হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (তাঁর সঙ্গের অকৃত্রিম সম্পর্কের কথা ভেবে) তাঁর থেকে মুখ ফিরিয়ে নেন এবং সর্দারদের সাথে কথা বলতে লিপ্ত হন। তখন এ আয়াত অবতীর্ণ হয়—

عَبَسَ وَتَوَلَّى - اَنْ جَاءَهُ الْاَعْمٰى - وَمَا يُدْرِيْكَ لَعَلَّهٗ يَزَّكّٰى - اَوْيَذَّكَّرُ فَتَنْفَعَهُ الذِّكْرٰى - اَمَّا مَنِ اسْتَغْنٰى - فَاَنْتَ لَهٗ تَصَدّٰى - وَمَا عَلَيْكَ اَلَّا يَزَّكّٰى - وَاَمَّا مَنْ جَاءَكَ يَسْعٰى - وَهُوَ يَخْشٰى - فَاَنْتَ عَنْهُ تَلَهّٰى -

উপরোক্ত আয়াতে 'অন্ধ' দ্বারা হযরত ইবনে উম্মে মাকতুমই উদ্দেশ্য। তাঁর উচ্চমর্যাদার প্রমাণের জন্য এটিই কম কি যে পবিত্র কুরআন তাঁর খোদাভীতির সাক্ষ্য দিয়েছে।

পবিত্র মদীনায় হিজরতের পর যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম জিহাদ বা অন্য কোন কাজে মদীনার বাহিরে গমন করতেন, তখন অধিকাংশ সময় হযরত ইবনে উম্মে মাকতুম (রাযিঃ)কেই মদীনায় তাঁর প্রতিনিধি নিয়োগ করতেন। সুতরাং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৩ বার তাঁকে পবিত্র মদীনায় নিজের প্রতিনিধি নিযুক্ত করেছেন।

যদিও পবিত্র কুরআন তাঁকে জিহাদের দায়িত্ব থেকে মুক্ত করেছিল। কিন্তু তাঁর জিহাদের স্পৃহা এত বেশী ছিল যে, তিনি অনেক যুদ্ধেই

অংশগ্রহণ করেন। তিনি সেনাপতির নিকট আবেদন করেন যে, পতাকা আমার হাতে দিন। কেননা, আমি অন্ধ হওয়ার কারণে পালাতে পারব না। সুতরাং হযরত উমর (রাযিঃ)এর যুগে ইরানের সঙ্গে জগতখ্যাত কাদেসিয়ার যুদ্ধে তিনি অংশগ্রহণ করেন। তিনি কালো রঙের একটি পতাকা ধারণ করেছিলেন এবং বক্ষে বর্ম পরেছিলেন।

তার কাদেসিয়ার যুদ্ধের পরবর্তী সময়ের অবস্থা সম্পর্কে জানা যায় না। কেউ কেউ বলেন, তিনি কাদেসিয়াতেই শহীদ হয়েছেন। আর কেউ বলেন যে, সেখান থেকে পবিত্র মদীনায় ফিরে আসেন এবং পবিত্র মদীনাতেই তিনি ইন্তেকাল করেন।

কিতাবে তাঁর সিরিয়া আসার আলোচনা আমি তালাশ করেও পাইনি। এজন্য আমি খুঁজে পাইনি যে, তিনি দিমাশ্‌কের এই কবরস্থানে কিরূপে সমাধিস্থ হলেন এবং এটি তাঁর কবর হওয়ার বিষয়টি যথার্থ কিনা?

উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)

এ কবরস্থানে আরেকটু অগ্রসর হলে আরেকটি মাযার রয়েছে। যে মাযারকে উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর কবর বলা হয়।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর আসল নাম ছিল রমলা। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযওয়াজে মুতাহ্‌হারাতের অন্যতম। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে তাঁর বিবাহের ঘটনাটি বড় বিচিত্র। তিনি হযরত আবু সুফিয়ান (রাযিঃ)এর মেয়ে ছিলেন। হযরত আবু সুফিয়ান (রাযিঃ) মক্কা বিজয়ের সময় মুসলমান হন। কিন্তু ইতিপূর্বে তিনি সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের শত্রু ছিলেন। বদর যুদ্ধে আবু জেহেল ও অন্যান্যরা মারা গেলে মক্কার কাফেরদের নেতৃত্ব তাঁরই হাতে আসে। সে কারণে তিনি ওহুদ, খন্দক ও অন্যান্য যুদ্ধে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিলেন।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ছিলেন সেই আবু সুফিয়ানেরই মেয়ে। আবু সুফিয়ান উবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের সঙ্গে তার বিবাহ দিয়েছিলেন।

আবু সুফিয়ানের গৃহে রাতদিন মুসলমানদের বিরুদ্ধাচরণের চর্চা চলত। কিন্তু এটি ইসলামের নির্মল সত্যতার আকর্ষণ ছিল যে, এরূপ শত্রুর গৃহে আবু সুফিয়ানের এই মেয়ে এবং জামাই উভয়ে মুসলমান হয়ে যান। সে সময় ইসলাম কবুল করা অসংখ্য বিপদাপদকে ডেকে আনার নামান্তর ছিল। বিশেষ করে এমন পরিবারে ইসলাম গ্রহণ করা আরো অধিক মারাত্মক অপরাধ ছিল, যেখানে দিন–রাত মুসলমানদের বিরুদ্ধে পরিকল্পনা করা হত।

সুতরাং হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) এবং তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ বিন জাহাশ উভয়ে পবিত্র মক্কা থেকে হিজরত করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। তখন বিরাট সংখ্যক মুসলমান হিজরত করে ইথিওপিয়া চলে গিয়েছিলেন। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ও তাঁর স্বামীও ইথিওপিয়া গিয়ে বসবাস শুরু করেন। সেখানেই তাঁদের মেয়ে হাবীবা জন্মগ্রহণ করেন। সে কারণেই তাঁকে উম্মে হাবীবা বলা হয়।

এক রাত্রিতে হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর স্বামী উবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের মুখমণ্ডল বিশ্রীভাবে বিকৃত হয়ে গেছে। তিনি ভীত হয়ে জেগে ওঠেন এবং মনে মনে ভাবতে থাকেন সম্ভবতঃ উবায়দুল্লাহ বিন জাহাশের অবস্থার খারাপ কোন পরিবর্তন আসবে। যখন স্বামীর সঙ্গে দেখা হলো, তখন সে বলল, আমি সকল ধর্ম সম্পর্কে চিন্তা–ভাবনা করেছি এবং এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে, খৃষ্টধর্ম থেকে উৎকৃষ্ট কোন ধর্ম নেই। তাই আমি খৃষ্টান হয়ে গেছি। ভেবে দেখুন, একথা শুনে হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) কেমন আঘাত পেয়েছেন। তিনি তাড়াতাড়ি তাঁর স্বপ্ন উবায়দুল্লাহকে শুনিয়ে ধর্মান্তর থেকে বিরত রাখার চেষ্টা করেন, কিন্তু তার ভাগ্যে হেদায়াত ছিল না। সে স্বপ্নের বিষয়টিকে গুরুত্ব না দিয়ে প্রত্যাখ্যান করল এবং মদপানে লিপ্ত হল এবং ধর্মান্তরিত অবস্থাতেই তার মৃত্যু হয়।

এ সময়ে হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর অসহায়ত্বের অনুমান করাও কঠিন। তিনি ইসলামের খাতিরে মা, বাপ, ভাই, বোন এবং পুরো পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন। এমনকি মাতৃভূমিকেও ত্যাগ করেছিলেন। সবশেষে একমাত্র স্বামী এই ভিনদেশে হিতাকাঙ্খী ও

সহানুভূতিশীল হতে পারত। কিন্তু সেও মুরতাদ হল এবং কয়েক দিনের মধ্যে মৃত্যুবরণ করল। এখন তিনি এই প্রবাস জীবনে সম্পূর্ণ একাকী রয়ে গেলেন।

এই অসহায় অবস্থায় এক রাত্রে ঘুমের ঘোরে স্বপ্নে দেখেন, একজন আহ্বানকারী তাঁকে উম্মুল মুমিনীন বলে আহ্বান করছে। এই স্বপ্নের তিনি এই ব্যাখ্যা করেন যে, হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে বিবাহ করবেন।

এ স্বপ্ন দেখার কয়েকদিন পরেই তাঁর গৃহদ্বারের কড়া বেজে উঠল। দরজা খুলে দেখেন আবিসিনিয়ার নরপতি নাজ্জাশীর একজন দাসী (তার নাম আবরাহা) বাদশাহের পয়গাম নিয়ে এসেছে। দাসী বলল ঃ 'আমাকে বাদশাহ পাঠিয়েছেন। তিনি বলেছেন যে, "আমার নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পত্র এসেছে। তিনি আমাকে এ দায়িত্ব দিয়েছেন যে, আমি আপনার সঙ্গে তাঁর বিবাহের ব্যবস্থা করি। তাই আপনি কাউকে আপনার বিবাহের উকিল বানিয়ে দিন, যেন সে আপনার পক্ষ থেকে বিবাহের কার্যাদি সম্পন্ন করতে পারে।"

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) একথা শুনে অত্যন্ত পুলকিত হন। সেই আনন্দে তিনি তাঁর পরিহিত সব অলংকার খুলে ঐ দাসীকে দিয়ে দেন। হযরত খালিদ বিন সাঈদ বিন আস (রাযিঃ)এর নিকট সংবাদ পাঠিয়ে তাঁকে নিজের পক্ষ থেকে উকিল নির্ধারণ করেন। নাজ্জাশী হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের চাচাত ভাই হযরত জাফর বিন আবু তালিবকে এবং অন্যান্য মুসলমানদেরকে একত্রিত করলেন। উপস্থিত সমাবেশে তিনি বিবাহের খুৎবা পাঠ করেন এবং হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পক্ষ থেকে হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর ৪০০ স্বর্ণমুদ্রা মোহর নির্ধারণ করে তখনই তা নিজের পক্ষ হতে হযরত খালিদ বিন সাঈদের হাতে অর্পণ করেন। হযরত খালিদ বিন সাঈদ (রাযিঃ) উকিল হয়ে এই বিবাহ কবুল করেন। বিবাহ শেষে সব লোক চলে যেতে আরম্ভ করলে নাজ্জাসী বললেন, আপনারা সকলেই একটু অপেক্ষা করুন। নবীদের সুন্নাত হলো বিবাহের পর তাঁরা ওলীমাও করে থাকেন। সুতরাং খাবার আনা হলো। খাবার শেষে সকলে বিদায় হলেন।

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) বলেন, আমাকে মোহর স্বরূপ যে ৪০০ স্বর্ণমুদ্রা দেওয়া হয়, তার মধ্য থেকে ১০০ স্বর্ণমুদ্রা আবরাহাকে অধিক পুরস্কার হিসেবে দিতে চাই। কিন্তু সেই দাসী বলল, বাদশাহ আমাকে আপনার থেকে কোনকিছু নিতে নিষেধ করেছেন এবং আপনি যেসব অলংকার আমাকে দিয়েছিলেন সেগুলোও আপনাকে ফিরিয়ে দেওয়ার জন্য তাকীদ করেছেন। এর পরিবর্তে তিনি নিজে আমাকে অনেক কিছু দিয়েছেন।

নাজ্জাশী (রাযিঃ) পরে হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর খিদমতে অনেক উপঢৌকন পাঠান। তার মধ্যে বাদশাহর বিশেষ সুগন্ধিও ছিল। বাদশাহ অত্যন্ত সম্মানের সঙ্গে তাঁকে পবিত্র মদীনায় পাঠানোর ব্যবস্থা করেন। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) যখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট পবিত্র মদীনায় যাত্রা করেন, তখন দাসী আবরাহা তার নিকট এসে বলল ঃ আমিও মুসলমান হয়েছি। আমার পক্ষ থেকে সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সালাম জানাবেন। হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) সালাম পৌঁছানোর ওয়াদা করলেন এবং বিদায় হলেন। পবিত্র মদীনায় পৌঁছে তিনি ওয়াদা মোতাবেক হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট আবরাহার সালাম পৌঁছালেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সম্পূর্ণ ঘটনা শুনে মুচকি হাসলেন। আবরাহার জন্য দু'আ করলেন।

এই ঘটনার পর হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র স্ত্রী এবং উম্মুল মুমিনীনের মর্যাদা লাভ করেন। অপরদিকে তাঁর পিতা আবু সুফিয়ান পূর্ববৎ মুসলমানদের সবচেয়ে বড় প্রতিপক্ষ ছিলেন। হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় যুদ্ধ বন্ধের যে চুক্তি হয়েছিল, স্বয়ং মক্কার কাফেররা তার বিরুদ্ধাচরণ করে সেই চুক্তি ভঙ্গ করে দেয়। ফলে সন্ধি শেষ হয়ে যায়। আবু সুফিয়ান ধারণা করে যে, এখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে কোন মুহূর্তে মক্কার উপর আক্রমণ করতে পারেন। তাই তিনি যুদ্ধ বন্ধের মেয়াদ বৃদ্ধির প্রস্তাব নিয়ে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে পবিত্র মদীনায় হাযির হন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যান করেন।

এক্ষণে তার স্মরণ হয় যে, তাঁর মেয়ে [হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)]এর নিকট গিয়ে তাঁর দ্বারা সুপারিশ করাবেন। দুনিয়ার সাধারণ নিয়মানুযায়ী তার এই প্রত্যাশা অহেতুকও ছিল না যে, মেয়ে তাঁর স্বামী (হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম)এর নিকট অবশ্যই সুপারিশ করবেন। সুতরাং আবু সুফিয়ান হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর নিকট যান। প্রাথমিক সাক্ষাতের পর তিনি বিছানায় বসতে গেলে হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) দ্রুত অগ্রসর হয়ে বিছানা উঠিয়ে ফেলেন। আবু সুফিয়ান জিজ্ঞেস করলেন ঃ "এই বিছানা আমার উপযুক্ত নয়, না আমি এই বিছানার উপযুক্ত নই?" হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) উত্তর দিলেন ঃ "এটি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের বিছানা। আর আপনি এখনও পর্যন্ত কুফুরী এবং শিরকীর অপবিত্রতায় লিপ্ত।"

আবু সুফিয়ান তার মেয়ের এই উত্তর শুনে বিচলিত হন এবং বলেন, আমার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার পর তোমার মধ্যে কত পরিবর্তন এসেছে।

ইনিই ছিলেন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)! হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের পরও তিনি ৩০/৪০ বছর বেঁচেছিলেন। হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ) ছিলেন তাঁর ভ্রাতা। এজন্যই খালুল মুমিনীন (মুসলমানদের মামা) তার উপাধি প্রসিদ্ধ হয়। যখন তিনি খলীফা হন, তখন হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) তাঁর সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য দিমাশ্‌ক আগমন করেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) তাঁর নিকট থেকে অনেকগুলো ফেকাহর মাসআলা শিক্ষা করেন এবং অনেক হাদীস তাঁর থেকে বর্ণনা করেন। এতটুকু তো ইতিহাসে প্রমাণিত আছে। পরবর্তী অবস্থা সম্পর্কে কারো কারো ধারণা এই যে, হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ) দিমাশকেই অবস্থান করেন। এখানেই তাঁর মৃত্যু হয় এবং আল বাবুস সগীর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়। হাফেয ইবনে আসাকির (রহঃ) আল বাবুস সগীরের কবরসমূহের মধ্যে তাঁর কবরের কথাও উল্লেখ করেছেন। কিন্তু হাফেয যাহাবী (রহঃ) কঠোরভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেছেন। তিনি বলেন যে, তাঁর কবর দিমাশকে নয় বরং মদীনা মুনাওয়ারায়। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিঃ)

হযরত উম্মে হাবীবা (রাযিঃ)এর নামে সম্পৃক্ত মাযারের অদূরেই আর একটি কবর আছে। তাতে লেখা আছে এটি হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ)এর কবর। এতে সাধারণতঃ লোকেরা মনে করে যে, এটি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ)এর মাযার, যিনি সরকারে দোআলম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের আযওয়াজে মুতাহহারতের অন্যতম। সুতরাং লোকেরা আমাদেরকে একথাই বলল। কিন্তু অধমের নিকট কথাটি এজন্য সঠিক মনে হয় না যে, হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ)এর মাযার পবিত্র মদীনায় আছে বলে বলা হয়। হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ)এর দিমাশকে সমাধিস্থ হওয়ার কোন অর্থ এজন্য বুঝে আসে না যে, ইতিহাসের কোথাও তার দিমাশক আসার কথাই উল্লেখ নেই। পরবর্তীতে হাফেজ শামসুদ্দিন যাহাবী প্রণীত ছিয়ারু আলামিন নুবালা গ্রন্থে দেখলাম যে, দিমাশকের আল বাবুস সাগীরে উম্মে সালমা নামে যে মহিলা সমাধিস্থ আছেন, তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত উম্মে সালমা (রাযিঃ) নন, বরং তিনি এক আনসারী মহিলা সাহাবী। তাঁর নাম হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিঃ) তাঁর উপনামও যেহেতু উম্মে সালমা ছিল, তাই এই ভুল বুঝাবুঝির সৃষ্টি হয়।

হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিঃ) হযরত মুআয বিন জাবাল (রাযিঃ)এর চাচাত বোন। তিনি উচ্চমানের বাগ্মীও ছিলেন। এ কারণে তাঁর উপাধি 'খাতিবাতুন নিছা' প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম থেকে অনেক হাদীসও বর্ণনা করেছেন। হযরত উমর (রাযিঃ)এর শাসনকালে রোমান সেনাবাহিনীর সঙ্গে ইয়ারমুক নামক স্থানে যেই চূড়ান্ত যুদ্ধ সংঘটিত হয়, তাতে অন্যান্য মহিলাদের সঙ্গে তিনিও অংশগ্রহণ করেন। এসব মহিলা তাঁদের আহত আপনজনদের ঔষধপত্র ও পট্টি (ব্যাণ্ডিজ) ইত্যাদি লাগানোর জন্য যুদ্ধে যেতেন। যুদ্ধের কঠিন মুহূর্তে মুসলমানদের সাহস যোগাতেন। কিন্তু ইয়ারমুক যুদ্ধের সময় এমন প্রচণ্ড লড়াই হয় যে, নিজেদের আত্মরক্ষার জন্য মহিলাদেরও সম্মুখ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হয়। এই সময় হযরত আসমা বিনতে ইয়াযীদ (রাযিঃ) তাঁর তাঁবুর খুঁটি দ্বারা নয়জন রোমান

সৈন্যের লীলা সাঙ্গ করে দেন। আল্লাহ তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন এবং তাঁকে সন্তুষ্ট করেছেন।

হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাযিঃ)

এখানে আসমা নামের আরেকজন মহিলার মাযার রয়েছে। অর্থাৎ আসমা বিনতে উমাইস (রাযিঃ)এর মাযার। ইনিও একজন খ্যাতনামা মহিলা সাহাবী। তিনি উম্মুল মুমিনীন হযরত মায়মুনা (রাযিঃ)এর বৈপিত্রেয় বোন ছিলেন। ইসলামের একদম শুরুর অবস্থায় তিনি মুসলমান হন। হযরত জাফর তাইয়ার (রাযিঃ)এর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়েছিল। হযরত জাফর তাইয়ার (রাযিঃ) হাবশায় হিজরতের সময় তিনিও তাঁর সঙ্গে ছিলেন। সপ্তম হিজরীতে স্বামীর সঙ্গে হাবশা থেকে পবিত্র মদীনায় ফিরে আসেন। হযরত জাফর (রাযিঃ) মুতার যুদ্ধে শহীদ হন। এ ঘটনা পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর সঙ্গে তাঁকে বিবাহ দেন।

বিদায় হজ্জের সময় হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সঙ্গে যখন তিনি হজ্জের উদ্দেশ্যে পবিত্র মদীনা থেকে যাত্রা করেন, তখন যুলহুলায়ফাতে মুহাম্মদ বিন আবু বকর জন্মগ্রহণ করেন। এতদসত্ত্বেও তিনি এহরাম বেঁধে হজ্জের সফর অব্যাহত রাখেন। হযরত ফাতিমা (রাযিঃ)এর অন্তিম রোগে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর পক্ষ হতে হযরত আসমা (রাযিঃ) তাঁর সেবা শুশ্রূষা করেন। হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর মৃত্যুর পর তিনি হযরত আলীর সঙ্গে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। তাঁর গর্ভে দুটি সন্তান জন্মগ্রহণ করে। একবার তার দুই ছেলে মুহাম্মদ বিন আবু বকর এবং মুহাম্মদ বিন জাফর এর মধ্যে বিতর্ক হয়। মুহাম্মদ বিন আবু বকর বলেন, আমার পিতা [হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)] শ্রেষ্ঠ। আর মুহাম্মদ বিন জাফর বলেন, আমার পিতা [অর্থাৎ জাফর তাইয়ার (রাযিঃ)] শ্রেষ্ঠ। হযরত আলী (রাযিঃ) হযরত আসমা বিনতে উমাইস (রাযিঃ)কে বলেন ঃ তুমি এর ফয়সালা দাও। হযরত আসমা উত্তর দেন ঃ আমি আরবের কোন যুবককে জাফর

থেকে উৎকৃষ্ট দেখিনি এবং কোন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে আবু বকর থেকে উৎকৃষ্ট পাইনি। হযরত আলী (রাযিঃ) বললেন ঃ তুমি আমার জন্য তো কিছুই বাদ রাখনি। তবে তুমি যে উত্তর দিয়েছ, যদি তুমি এতদভিন্ন অন্য কোন উত্তর দিতে তাহলে আমি অসন্তুষ্ট হতাম। তখন হযরত আসমা (রাযিঃ) বললেন ঃ এই তিন ব্যক্তি যাঁর মধ্যে আপনি নিম্নমানের—সকলেই ভাল মানুষ।

দিমাশ্‌কের জামে উমুভীতে

আল বাবুস সাগীর কবরস্থান যখন দেখা শেষ হয়,তখন মাগরিবের আযান হচ্ছিল। আমরা নিকটেরই একটি মসজিদে মাগরিব নামায আদায় করি। নামাযান্তে দিমাশকের জগতবিখ্যাত ঐতিহাসিক মসজিদ জামে উমুভী অভিমুখে যাত্রা করি।

এ বিশাল মসজিদ পুরাতন শহরের মাঝখানে অবস্থিত। তার দরজা পর্যন্ত পৌছার সড়কগুলো এত সংকীর্ণ এবং জনাকীর্ণ যে, গাড়ী অনেক দূরে পার্ক করতে হলো। সংকীর্ণ গলিপথ অতিক্রম করে আমরা ঐ মসজিদের নিকট পৌছি। ইদানিং মসজিদের আশপাশ থেকে বাড়ীঘর এবং দোকানপাট সরিয়ে দিয়ে মসজিদের সম্মুখে প্রসিদ্ধ ক্যাম্পাস তৈরী করা হয়েছে। তা অতিক্রম করে আমরা মসজিদে প্রবেশ করি।

সেই জামে উমুভী, যা এককালে স্থাপত্য শিল্পের আশ্চর্য বস্তুর মধ্যে গণ্য করা হত। বনু উমাইয়া গোত্রের প্রসিদ্ধ খলীফা ওলীদ বিন আবদুল মালিক এটি নির্মাণ করেন। রোমানদের রাজত্ব কালে এখানে খৃষ্টানদের একটি গীর্জা ছিল। তাকে 'কানিছায়ে ইউহান্না' বলা হত। হযরত উমর (রাযিঃ)এর শাসনকালে মুসলমানগণ যখন দিমাশক আক্রমণ করেন তখন অর্ধেক শহর যুদ্ধের মাধ্যমে শক্তি দ্বারা বিজয় হয়। কিন্তু প্রায় অর্ধেক শহর জয় হলে শহরের অধিবাসীরা অস্ত্র সমর্পণ করে মুসলমানদের সঙ্গে সন্ধি করে। ফলে অবশিষ্ট অর্ধাংশ সন্ধির মাধ্যমে জয় হয়। ইসলামের নীতি এই যে, শত্রুদের যে এলাকা যুদ্ধের মাধ্যমে জয় হয়, তার ব্যাপারে ইসলামী সরকারের পরিপূর্ণ অধিকার রয়েছে। সে এতে যা ইচ্ছা করতে পারে, কিন্তু সন্ধির মাধ্যমে যে অঞ্চল বিজয় হয়, তাতে

সন্ধির নিয়ম মেনে চলতে হয়। ঘটনাচক্রে ঐ গীর্জার অর্ধাংশ যুদ্ধ দ্বারা এবং অপর অর্ধাংশ সন্ধির মাধ্যমে জয় হয়েছিল। যে অংশ যুদ্ধ দ্বারা জয় হয়েছিল তাতে মুসলমানরা শরীয়ত প্রদত্ত অধিকারের ভিত্তিতে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। কিন্তু অবশিষ্ট অর্ধাংশ যা সন্ধির মাধ্যমে জয়, হয় তা চুক্তির শর্তানুপাতে গীর্জারূপেই রেখে দেওয়া হয়।

সুতরাং দিমাশক বিজয়ের পর অনেক বছর পর্যন্ত এখানে মসজিদ এবং গীর্জা একসাথে অবস্থান করে। ওলীদ বিন আবদুল মালিকের যুগে নামায আদায়কারীদের সংখ্যা বেশী হওয়ায় মসজিদ সংকীর্ণ হয়ে যায়। অপরদিকে মসজিদের একেবারে সামনাসামনি গীর্জা থাকায় একধরনের অসন্তোষ শুরু থেকেই চলে আসছিল। অলীদ বিন আবদুল মালিক চাচ্ছিলেন যে, গীর্জার অংশও মসজিদের অন্তর্ভুক্ত করা হোক। কিন্তু চুক্তির শর্তানুযায়ী গীর্জা ঠিক রাখতে বাধ্য ছিলেন। তিনি গীর্জার হর্তাকর্তাদেরকে ডেকে তাদের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বলেন এবং এই জায়গার পরিবর্তে তাদেরকে চার গীর্জা সমান জায়গা দেওয়ার অথবা তার বিনিময়ে তাদের ইচ্ছামত মূল্য পরিশোধ করার প্রস্তাব করেন, কিন্তু তারা এখান থেকে গীর্জা সরিয়ে নেয়ার ব্যাপারে সন্তুষ্ট ছিলেন না।

এতটুকু সম্পর্কে তো সকল বর্ণনা একমত। এর পরের বর্ণনাসমূহে বিভিন্নতা রয়েছে। কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, খৃষ্টানদের অস্বীকৃতির পর ওলীদ বিন আবদুল মালেক জোরপূর্বক এই অংশ দখল করে সেখানে মসজিদ নির্মাণ করেন। পরে হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ)এর শাসনকাল এলে খৃষ্টানরা তাঁর নিকট এই জবরদস্তির ব্যাপারে অভিযোগ করে। তখন হযরত উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ) খৃষ্টানদের পক্ষে রায় দেন এবং এ অংশ থেকে মসজিদ বিলুপ্ত করে তা খৃষ্টানদের হাতে সমর্পণ করার ইচ্ছা করেন। কিন্তু পরে দিমাশকের গভর্নর খৃষ্টানদের দাবী অনুযায়ী বিনিময় দিয়ে রাজী করান, তখন তারা সন্তুষ্ট মনে এ অংশ ছেড়ে চলে যায়।

পক্ষান্তরে কোন কোন বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, অলীদ বিন আবদুল মালেক শুরু থেকেই খৃষ্টানদের উপরে কোন প্রকার জবরদস্তি করেননি বরং তিনি বলেছিলেন, যদি তারা এই গীর্জার ভূমি মসজিদের জন্য দিতে

রাজী হয়, তাহলে দিমাশক ও তার উপকণ্ঠের যেসব অঞ্চল মুসলমানরা শক্তি দ্বারা জয় করেছে সেখানকার যেই চার গীর্জা ধ্বংস করে দেওয়ার সিদ্ধান্ত হয়েছে সেই ফয়সালা প্রত্যাহার করা হবে এবং এই চার গীর্জা তাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। সুতরাং এই কথায় খৃষ্টানরা স্বেচ্ছায় এই গীর্জা মুসলমানদের হাতে দিয়ে দেয়।

যাই হোক ওলীদ যখন গীর্জাটি নিজের মালিকানায় এনে তা ধ্বংস করার ইচ্ছা করেন, তখন খৃষ্টানরা বলে যে, আমাদের এখানে এই বিশ্বাস প্রসিদ্ধ আছে যে, যে ব্যক্তি এই গীর্জা ধ্বংস করবে সে উন্মাদ হয়ে যাবে। তাই আপনি এটি ধ্বংস করবেন না। কিন্তু ওলীদ বললেন, সত্যি যদি তাই হয় তাহলে আমি নিজের হাতে এর ভাঙ্গার কাজ শুরু করব। সুতরাং প্রথম হাতুড়ী ওলীদ মেরেছিলেন। তারপর অন্যান্য মুসলমানরা তা মিসমার করে ফেলেন।

তারপর ওলীদ বিন আবদুল মালেক উভয় অংশকে একত্রিত করে বিশাল এক মসজিদের নির্মাণ কাজ শুরু করেন। যা স্থাপত্য শিল্পের দিক থেকে সে যুগের সর্ববৃহৎ এবং সবচেয়ে সুন্দর মসজিদ ছিল। কথিত আছে যে, এর নির্মাণ কাজে ১ কোটি বারো লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা ব্যয় হয়েছিল। মসজিদের ভিতরের হলকক্ষ যেখানে মেহরাব নির্মিত হয়েছে, পূর্ব পশ্চিমে ২০০ ফুট লম্বা এবং ১০০ ফুট চওড়া নির্মাণ করা হয়। কেবলার দিকের প্রাচীরে মর্মর পাথরের সঙ্গে স্বর্ণও লাগানো হয়। এই হলের উপর জমকালো এক গম্বুজ নির্মাণ করা হয়। একে 'কুব্যাতুন নাছর' বলে। এটি এককালে দিমাশকের সর্বোচ্চ ভবন ছিল। তার জাঁকজমকপূর্ণ দৃশ্য সমগ্র বিশ্বে অদ্বিতীয় ছিল। স্পেনের খ্যাতনামা পর্যটক মুহাম্মদ বিন জুবাইর ৫৮৭ হিজরীতে সেখানে পৌঁছেন। তখন তিনি সেই গম্বুজে আরোহনের অবস্থা বর্ণনা করতে গিয়ে লেখেন—

"আমি বিশ্বের যেসব বিরল ও বিস্ময়কর দৃশ্য দেখেছি এবং বিরাট বিরাট জাঁকজমকপূর্ণ ভবন প্রত্যক্ষ করেছি, তার মধ্যে জামে উমুভীর গম্বুজ আরোহণের অভিজ্ঞতা সর্ববৃহৎ এক অভিজ্ঞতা ছিল।"

ইবনে জুবাইর আরো লেখেন ঃ জামে উমুভীর গম্বুজের এই বৈশিষ্ট্যও প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, তাতে মাকড়সা জাল বুনতে পারে না। চামচিকাও

তাতে বাসা বানাতে পারে না।

মসজিদের কেবলার দিকের প্রাচীরে কয়েকটি মেহরাব রয়েছে। এগুলো উসমানী খেলাফতকালে ফেকাহভিত্তিক বিভিন্ন মাযহাবের পৃথক পৃথক মুসাল্লারূপে ব্যবহৃত হত। এখনও জামে উমুভীতে হানাফী এবং শাফেঈদের ভিন্ন ভিন্ন জামাত হয়। কিন্তু উভয় জামাতে একই মেহরাব ব্যবহৃত হয়। তবে এখন সেসব জামাতে ফেকাহর মাযহাবের ভিত্তিতে মানুষের অংশগ্রহণ কম এবং তাদের সুবিধার ভিত্তিতে বেশী হয়। যেমন, সবসময় শাফেঈ মাযহাবের জামাত আগে হয় এবং হানাফী মাযহাবের জামাত পরে হয়। যে ব্যক্তি তার ব্যস্ততার দিক থেকে যেই জামাতে অংশগ্রহণের সুযোগ পায় সে তাতে অংশগ্রহণ করে। চাই তা হানাফীই হোক বা শাফেঈ হোক।

মসজিদের হলে একটি কবর রয়েছে। এই কবর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, এখানে হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)এর পবিত্র মাথা দাফন করা হয়েছে। হাফেজ ইবনে আসাকির (রহঃ) একটি বর্ণনা নকল করেছেন যে, জামে উমুভীর নির্মাণ কালে একটি গুহা দৃষ্টিগোচর হয়। ওলীদ বিন আবদুল মালিককে এ বিষয়ে অবহিত করা হলে তিনি নিজে ঐ গর্তে প্রবেশ করেন। তাতে একটি সিন্দুক রক্ষিত পান। ঐ সিন্দুকে একজন মানুষের মাথা রাখা ছিল। তাতে লেখা ছিল ঃ 'এটি হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)এর মাথা।' যায়েদ বিন ওয়াকীদ, যিনি সে সময় মসজিদ নির্মাণ কাজের তত্ত্বাবধানে ছিলেন, তিনি বলেন ঃ ' আমি সেই পবিত্র মাথা দর্শন করেছি। তাঁর মুখাবয়ব, ত্বক এবং চুলের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তনও ঘটেনি।' এখানে আল্লাহ তাআলার আরো একজন মহিমান্বিত পয়গাম্বরকে সালাম করার সৌভাগ্য হয়।

হযরত ইয়াহইয়া (আঃ)এর মাযারের পশ্চিম দিকে একটি দীর্ঘ ও প্রশস্ত প্রদীপ বসানো আছে। প্রদীপটি মোমের তৈরী। কিন্তু তার উচ্চতা ১২ ফুট এবং পরিধি প্রায় ২ ফুট। জামে উমুভীতে এমন অনেকগুলো প্রদীপ রাখা ছিল। বিদ্যুৎ আবিষ্কারের পূর্বে সেসব প্রদীপ আলোর জন্য ব্যবহার করা হত। আমি একটি কিতাবের মধ্যে পড়েছিলাম, রাত্রিতে যখন প্রদীপ নিভিয়ে দেয়া হত তখন সম্পূর্ণ মসজিদ মেশকের সুগন্ধিতে এই পরিমাণ

ভরে যেত যে, মানুষ এর কড়া ঘ্রাণ সহ্য করতে না পেরে বের হয়ে যেত।

মসজিদের হল থেকে আঙ্গিনার দিকে যেতে মাঝখানে একটি চওড়া বারান্দা আছে। বারান্দাটি আঙ্গিনার চতুর্দিক ঘিরে রেখেছে। এই বারান্দারই পূর্বের অংশের এক জায়গায় আরেকটি মাযার রয়েছে। হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর পবিত্র মাথা এখানে দাফন হয়েছে বলে প্রসিদ্ধ আছে। এ কথাটি বর্তমানে খুব প্রসিদ্ধি লাভ করেছে। এ ব্যাপারে একটি বর্ণনাও আছে যে, হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর শাহাদাতের পর তাঁর পবিত্র মাথা ইয়াযীদের নিকট দিমাশকে নিয়ে আসা হয়। এই বর্ণনার ভিত্তিতে এই ধারণা কিছুটা দৃঢ়ও হয় যে, পরে হয়ত এখানে সেই মাথা দাফন করা হয়েছে। কিন্তু আশ্চর্যের ব্যাপার এই যে, দিমাশকের এবং জামে উমুভীর প্রাচীন কালের ইতিহাস বর্ণনাকারী ঐতিহাসিকগণের কেহই একথা উল্লেখ করেননি যে, হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর পবিত্র মাথা এখানে দাফন করা হয়েছে। হাফেয ইবনে আসাকির (রহঃ) যিনি দিমাশকের মর্যাদা–গুরুত্ব, জ্ঞান–গরিমা এবং তার গর্বের বিষয়গুলো বর্ণনা করতে খুব লালায়িত ছিলেন এবং এই বিষয়ে তিনি জঈফ, মুনকার এবং মৌযু হাদীসও বর্ণনা করতে পিছপা হননি। তিনিও কোথায়ও হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর মাযারের উল্লেখ করেননি। আল্লামা আঈনী (রহঃ) প্রণীত 'তাম্বীহুত তালীব' যা দিমাশকের ইতিহাস সংক্রান্ত ইবনে আসাকিরের পর সর্ববৃহৎ উৎস। তিনিও এর উল্লেখ করেননি।

আল্লামা শিহাবউদ্দীন ইবনে ফজলুল্লাহ আল উমরী (মৃত ৭৪৯ হিজরী) তাঁর কিতাব 'মাসালিকুল আবছার ফি মামালিকিল আমছার' গ্রন্থে দিমাশকের জামে মসজিদ সম্পর্কে আলোচনা করেছেন। তাতেও হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর মাযারের কোন উল্লেখ নেই। শুধুমাত্র ইবনে জুবাইর তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তে উল্লেখ করেছেন যে, হযরত হুসাইন (রাযিঃ)এর পবিত্র মাথা এখানে ছিল। কিন্তু পরে তা কায়রো স্থানান্তর করা হয়। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

আমরা বারান্দার উত্তর–পূর্ব কোণায় পৌছে সেখানে বিরল বিস্ময়কর একটি গাড়ী দেখতে পাই। গাড়ীটি বাঁশ এবং কাঠের তক্তার তৈরী। তার নীচে লোহার দৈত্যাকৃতির চাকা লাগানো আছে। গাড়ীটি এত বড় যে, তা

বারান্দার বিরাট বড় অংশ দখল করে আছে। পথ প্রদর্শকগণ বললেন, এটি সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর বানানো মিনজানিক (ক্ষেপণাস্ত্র বিশেষ)। এটি তিনি অনেক যুদ্ধেই ব্যবহার করেছেন। এখন তা স্মৃতিস্বরূপ জামে উমুভীতে রেখে দেওয়া হয়েছে।

মসজিদের আঙ্গিনায় দাঁড়ালাম। চতুর্দিক থেকে মসজিদের দৃশ্য বড় নয়নাভিরাম মনে হল। 'কুব্বাতুন নাছর' ছাড়া মসজিদের তিনটি মিনারই (পূর্ব, পশ্চিম এবং আল আরছ মিনার) এখান থেকে দেখা যায়। কোনকালে আঙ্গিনার মধ্যে একটি ফোয়ারাও ছিল। তার পানি চন্দ্রের ন্যায় অর্ধবৃত্ত হয়ে পতিত হত। এর মনোরম দৃশ্য দেখতে অনেক দূর দূরান্ত থেকে মানুষ আসত। সে ফোয়ারা এখন আর নেই। ঐতিহাসিকগণ বর্ণনা করেন, জামে উমুভীর আঙ্গিনার উজ্জ্বলতা মানুষের মধ্যে দৃষ্টান্তস্বরূপ ছিল। এ আঙ্গিনা অনেক শতাব্দী যাবৎ ইলমে দ্বীনের তালেবে ইলেমের এবং বড় বড় উস্তাদ ও মাশায়েখদের কেন্দ্র ছিল। এখানে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সাগর তরঙ্গায়িত হত। নাজানি কত অসংখ্য গ্রন্থ এখানে বসে লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। জ্ঞান ও পাণ্ডিত্যের কত রবি-শশী এখান থেকে উদিত হয়েছে তার ইয়ত্তা নেই। শুনেছি এখনও এখানে কিছু শিক্ষাদানের সমাবেশ হয়। কিন্তু তা বেশীর ভাগ ওয়ায উপদেশের মাহফিল হয়ে থাকে। ইসলামী জ্ঞানভাণ্ডারের পঠন-পাঠনের সেই উচ্চ মাপকাঠি এদেশ থেকে অনেক আগেই বিদায় হয়েছে।

ঐতিহাসিক এই বিশাল মসজিদ মুসলমানদের উত্থান ও সৌভাগ্যের দিনও প্রত্যক্ষ করেছে। তার মাটিতে ফেরেশতা চরিত্রের এমন সব মানুষও সেজদা করেছেন, যারা বিশ্ববাসীর জন্য আদর্শরূপে আবির্ভূত হয়েছিলেন। আর বর্তমানে সেই মসজিদই এই উম্মতের অবক্ষয় ও অধঃপতনও প্রত্যক্ষ করছে এবং আমাদের মত মানুষের প্রাণশূন্য সিজদাও এরই মাটিতে অঙ্কিত হচ্ছে। ইনশাআল্লাহ এমন এক দিন আসবে, যখন উম্মতের শেষ অংশ হযরত ঈসা (আঃ) এবং ইমাম মাহদীর নেতৃত্বে এই মসজিদ থেকেই সাহস ও সংকল্পের নতুন কাফেলা নিয়ে বের হবে। তাঁদের হাতে হিদায়াতের সেই মশাল থাকবে, যার দ্বারা অন্ধকারে নিমজ্জিত মানবতার উপর পুনরায় একবার ন্যায় বিচার এবং

আল্লাহর ইবাদতের কিরণ বর্ষণ করবে। এবং বিশ্ব চরাচর যা আজ জুলুম ও অজ্ঞতার পাকে আবদ্ধ, তাতে পুনর্বার হেদায়েতের প্রভাত উদিত হবে।

নূরউদ্দীন জঙ্গীর মাযারে

জামে উমুভী থেকে বের হলাম। মসজিদের একেবারে সম্মুখে ইসলামী ইতিহাসের বীর কেশরী নূরুদ্দীন জঙ্গীর মাযার, সেখানে সালাম করার এবং ফাতেহা পাঠ করার সৌভাগ্য হয়।

নূরুদ্দীন জঙ্গী (রহঃ) ইসলামী ইতিহাসের সেই হাতে গোনা শাসকদের অন্যতম, যাঁরা তাঁদের ন্যায়বিচার, প্রজাপ্রীতি, দৃঢ় সংকল্প, বীরত্ব এবং সুশৃংখলায় খিলাফতে রাশেদার যুগের স্মৃতি তাজা করেন। আতাবুকী খান্দানের দৃঢ় সংকল্প এই মুজাহিদের সারাটি জীবন ক্রুশধারীদের সঙ্গে জিহাদের প্রান্তরে অতিবাহিত হয়। তিনি তাঁর প্রাণ বাজি রেখে নাজানি কতবার জার্মানী, ফ্রান্স এবং ইউরোপের অন্যান্য শক্তির রূপ পাল্টে দিয়েছেন। এটি সেই সময়ের কথা, যখন সালজুকি হুকুমাত অধঃপতনে চলে গিয়েছিল। আব্বাসী খিলাফত নানারকম বিপর্যয়ের শিকার ছিল এবং ইউরোপের ক্রুসেড শক্তি মুসলমানদের এই দুর্বলতার ফায়দা লুটে আলমে ইসলামকে গ্রাস করার প্রয়াসী ছিল। সেই নাজুক মুহূর্তে সর্বপ্রথম নূরুদ্দীন এর পিতা ইমাদুদ্দীন (রহঃ) এবং তাঁর পর নূরুদ্দীন জঙ্গী (রহঃ) মুসলিম উম্মাহর মধ্যে এক নবজাগরণ সৃষ্টি করেন এবং ইউরোপের ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দেন।

নূরুদ্দীন জঙ্গীর বিজয়গাঁথা এবং তাঁর কৃতিত্বের বিস্তারিত আলোচনার জন্য পূর্ণ এক গ্রন্থ প্রয়োজন। এখানে তা বিশদভাবে আলোচনা করার সুযোগ নেই, তবে আল্লামা ইবনে আছির জাযরী (রহঃ) যিনি অনেক উঁচু দরের ইতিহাসবিদ এবং মুহাদ্দিস এবং নূরুদ্দীন জঙ্গীর সমসাময়িক, তিনি তাঁর ইতিহাসগ্রন্থে নূরুদ্দীন জঙ্গীর শাসনকালের উপর যে সার্বিক আলোকপাত করেছেন তা এখানে তুলে না ধরে থাকতে পারছি না। আল্লামা ইবনে আছীর (রহঃ) লেখেন—

"আমি ইসলামী যুগের পূর্বের শাসকদের থেকে নিয়ে এ সময় পর্যন্ত সকল বাদশাহের ইতিহাস অধ্যয়ন করেছি। কিন্তু খোলাফায়ে রাশেদীন

এবং উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ) ছাড়া নূরুদ্দীনের চেয়ে উৎকৃষ্ট কোন শাসক আমার দৃষ্টিগোচর হয়নি। তিনি ন্যায়নিষ্ঠার প্রসার, জিহাদ পরিচালনা, জুলুম, নিপীড়নের মূলোৎপাটন, ইবাদত ও সাধনা, দয়া ও দাক্ষিণ্যকে স্বীয় জীবনের লক্ষ্য বানিয়ে ছিলেন। এ কাজেই তাঁর রাতদিন অতিবাহিত হত। যে কোন সম্প্রদায়ে যদি তাঁর এবং তাঁর পিতার মত দুইজন শাসক অতিবাহিত হত তবুও সে জাতির গর্বের জন্য যথেষ্ট। আর এখানে তো আল্লাহ্ পাক এক পরিবারে এরূপ দু'জন শাসক সৃষ্টি করেছেন। তাঁর শাসনাধীন দেশগুলোতে অবৈধ সকল ট্যাক্স মওকুফ করে দেন। তিনি মজলুম ব্যক্তির সঙ্গে—সে যে শ্রেণীরই হোক না কেন পূর্ণ ন্যায়বিচার করতেন। মজলুমের নালিশ সরাসরি শ্রবণ করতেন।

একবার এক ব্যক্তি একটি জমিনের ব্যাপারে তার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করে। আদালতের চাপরাশি সুলতানের খেলাধুলার জন্য নির্ধারিত সময়ে গিয়ে পৌছে। সুলতান তৎক্ষণাৎ তার সঙ্গে বিচারপতির আদালতে উপস্থিত হন। যাচাই বাছাইয়ের পর সম্পত্তি বাদীর পরিবর্তে নূরুদ্দীনের বলে প্রমাণিত হয়। ফলে বিচারপতি তাঁর পক্ষেই রায় দেন। রায় হওয়ার পর নূরুদ্দীন বিতর্কিত এই সম্পত্তি তাঁর পক্ষ থেকে বাদীকে দান করে দেন।

ক্ষমতার গদিতে হাজার মানুষ এসেছে এবং চলে গেছে, কিন্তু খুব কম মানুষই এরূপ অতিবাহিত হয়েছে, যারা এই গদিকে নিজের আখেরাত তৈরীর জন্য ব্যবহার করেছে এবং নিজেদের কৃতিত্বের ফলে চির অমর হয়ে আছে। আল্লাহতাআলা নূরুদ্দীন জঙ্গীর রুহের উপর তাঁর অনন্ত রহমত বর্ষণ করুন। তিনি এমনই একজন শাসক ছিলেন, তাঁর মাযার যিয়ারতের সময় ভক্তি ও ভালবাসার যে আবেগ উৎসারিত হয়, তা শব্দ ও ভাষায় ব্যক্ত করা সম্ভব নয়।

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহঃ)

জামে উমুভীর নিকটেই আরেকটি কবর রয়েছে, যা সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবীর। সেখানেও হাজির হলাম। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহঃ) সম্পর্কে মুসলিম পরিবারের প্রত্যেকটি শিশুও অবগত।

তিনি নূরুদ্দীন জঙ্গীর যোগ্যতম জেনারেলদের অন্যতম। নূরুদ্দীন (রহঃ) তার চাচা শেরকুহের সঙ্গে একটি যুদ্ধক্ষেত্রে তাঁকে মিসরে পাঠান। সেখানে তিনি তাঁর উন্নততর রণ কৌশল প্রদর্শন করেন। ফেরেঙ্গীদের অনেক আক্রমণ তিনি প্রতিহত করেন। পরিশেষে তিনি নূরুদ্দীন জঙ্গীর পক্ষ থেকে মিসরের শাসক নিযুক্ত হন এবং তাঁর প্রচেষ্টার ফলেই মিসর থেকে ফাতেমী হুকুমাত বিলুপ্ত হয়। নূরুদ্দীন জঙ্গীর মৃত্যুর পরে সিরিয়ার (নূরুদ্দীনের রাজধানী সিরিয়া ছিল) অধিবাসীরা তাঁকে সিরিয়ার হুকুমাত সামলানোর জন্য আহ্বান করে। এমনিভাবে তিনি একই সময়ে মিসর এবং সিরিয়া উভয় দেশের শাসক হন।

তাঁর শাসনকালে তিনি একদিকে অসংখ্য নির্মাণকার্য সম্পাদন করেন। অপরদিকে এই যুগেই ঈসায়ীরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে একের পর এক যুদ্ধ শুরু করে। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহঃ) সেসব যুদ্ধে ইউরোপের শক্তিসমূহের মুখে পরাজয়ের কালি লেপন করে দেন। সে যুগেই খৃষ্টানরা বায়তুল মুকাদ্দাসের উপর আধিপত্য বিস্তার করে রেখেছিল। সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী ৫৮৩ হিজরীতে মুসলমানদের প্রথম কিবলা তাদের দখলমুক্ত করে সেখানে ইসলামের পতাকা উড্ডীন করেন এবং সিরিয়ার যত অঞ্চল ক্রুসেডাররা দখল করেছিল তার সবগুলো স্বাধীন করেন।

তাঁরও সারাটি জীবন যুদ্ধের ময়দানে অতিবাহিত হয়। তিনিও ন্যায়বিচার, নেক আমল এবং তাকওয়া পরহেজগারীতে নূরুদ্দীন জঙ্গীর যথার্থ স্থলাভিষিক্ত ছিলেন। তিনি মিসরে ২৪ বছর এবং সিরিয়াতে ১৯ বছর শাসন করেন। কিন্তু ৫৮৯ হিজরীতে যখন তাঁর মৃত্যু হয়, তখন তাঁর উত্তরাধিকাররূপে কোন স্থাবর-অস্থাবর বা নগদ অর্থ কিছুই ছিল না। আল্লাহ তাঁর উপর অফুরন্ত রহমত নাযিল করুন।

সুলতান সালাহউদ্দীন আইয়ুবী (রহঃ)এর ইহধাম ত্যাগ করার ঘটনার পর ৮০০ বছরেরও অধিক সময় পার হয়েছে, আজ মুসলমানদের প্রথম কেবলা পুনরায় তাদের থেকে ছিনিয়ে নেয়া হয়েছে। আজ মুসলিম উম্মাহ পুনরায় কোন সালাহউদ্দীনের প্রতীক্ষা করছে এবং সমগ্র মুসলিম বিশ্ব এ বলে নীরব আহ্বান করছে।

হামিদিয়া বাজারে

দিমাশকের জামে মসজিদ এবং তৎসংলগ্ন সুলতান জঙ্গী ও সুলতান আইয়ুবীর মাযার যিয়ারত শেষে আমরা আরেকটু সম্মুখে অগ্রসর হই। আমাদের সম্মুখে হামিদিয়া বাজার। এটি দিমাশকের প্রাচীনতম বাজার। সাহাবায়ে কেরামের যুগ থেকেই বাজারটি এরূপ চলে আসছে বলে প্রসিদ্ধ। বরং অনেকে তো একে ইসলামপূর্ব বাইজেন্টিনা যুগের বলে থাকে। এটি বিশ্বের সেই অল্প কয়েকটি বাজারের অন্যতম, যা অনেক শতাব্দী যাবৎ তার প্রাচীন স্থানেই রয়েছে। তার অবস্থান স্থলে কোন পরিবর্তন ঘটেনি। এই বাজারে প্রাচীনতার নিদর্শন আজও পরিলক্ষিত হয়। দোকানগুলোতে আধুনিক সভ্যতার কিছু ধরন অবশ্যই এসেছে। কিন্তু তার ভাবধারা এখনও সেই প্রাচীন কালেরই রয়েছে সুদীর্ঘ ছাদ বিশিষ্ট বাজার। তার উভয় দিকে হরেক রকমের দোকানের দীর্ঘ সারি। সড়ক প্রাচীনকালের হিসেবে যথেষ্ট চওড়া। কিন্তু উভয় দিকে যতগুলো দোকান রয়েছে প্রত্যেক দোকানের সামনেই টেবিল বসানো আছে। ফলে সড়কে চলতে কাঁধে কাঁধে বাড়ি খায়। নিখাঁদ টেকসই সিরিয়ান বস্তু ক্রয় করতে হলে তা এই বাজারে এবং এর সংলগ্ন গলিগুলোতেই পাওয়া যায়। এ বাজার অতিক্রমকালে অতীতকালের ঘ্রাণ প্রতি পায়ে পায়ে মস্তিস্ককে প্রভাবিত করে এবং তার দরজায় ও প্রাচীরে ঐতিহাসিক ঘটনাবলীর অলিখিত তরঙ্গায়িত প্রতিচ্ছবি অনুভূত হয়। সময়টা শীতকাল, সিরিয়া ও তুরস্কের তৈরী উন্নতমানের সোয়েটার খুব সস্তায় বিক্রি হচ্ছে। সিরিয়ার মুদ্রাকে লিরা বলে। মূল্যের দিক থেকে তা পাকিস্তানী রুপীর প্রায় সমান। সঙ্গীরা সকলে এখান থেকে সোয়েটার ক্রয় করে। আল্লাহ তাআলা সিরিয়ার লোকদের প্রকৃতির মধ্যেই সৌন্দর্য ও সূক্ষ্মতা আকণ্ঠ ভরে দিয়েছেন। তাদের প্রতিটি বস্তুতে সুরুচি সুস্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। সরল কিন্তু সুন্দর তাদের স্বভাবের অঙ্গ। সুতরাং সিরিয়ার শিল্পজাত দ্রব্যের মধ্যে এই সুরুচি পূর্ণরূপে ভাস্বর।

হামিদিয়া বাজারের পিছনের এক গলিতে আমাদের গাড়ী পার্ক করা ছিল। বাজার অতিক্রম করে সেখানে যাই। আমাদের পথপ্রদর্শক এনায়েত সাহেব আমাদেরকে সেখান থেকে কাসিয়ুন পাহাড়ে নিয়ে যেতে

চাচ্ছিলেন, যেন সেখান থেকে দিমাশকের রাত্রিবেলার দৃশ্য উপভোগ করতে পারি, কিন্তু রাস্তা চলতে গিয়ে একটি জায়গা সম্পর্কে তিনি বললেন, এই জায়গাকে 'বাবুল জাবিয়া' বলা হয়। আমি এ নাম শুনে বিহ্বল হয়ে যাই। সেখানে গাড়ী থামাই। মূলতঃ এটি প্রাচীন দিমাশকের সেই প্রসিদ্ধ পশ্চিমের ফটক, যার নাম ইতিহাসে বাবুল জাবিয়া উল্লেখ রয়েছে।

বাবুল জাবিয়া

জাবিয়া মূলত দিমাশকের শহরতলীর একটি গ্রামের নাম। গ্রামটি দিমাশকের পশ্চিমে যুলানের উচ্চপৃষ্ঠের অদূরে অবস্থিত। হযরত উমর (রাযিঃ) যখন সিরিয়ায় আগমন করেন তখন তিনি দিমাশকে প্রবেশ না করে জাবিয়ায় অবস্থান করেন। সেখানে তিনি আলোড়ন সৃষ্টিকারী একটি ভাষণ দিয়েছিলেন। ভাষণটি 'খুৎবাতুল জাবিয়া' নামে প্রসিদ্ধ। এই ভাষণের অনেক খণ্ডাংশ হাদীস এবং ইতিহাস গ্রন্থে এসেছে। প্রাচীন যুগে কোন ব্যক্তি দিমাশক থেকে জাবিয়া যেতে চাইলে তাকে শহরের পশ্চিমের এই ফটক দিয়ে বের হতে হত। তাই এই ফটকের নাম বাবুল জাবিয়া রাখা হয়।

হযরত উমর (রাযিঃ)এর যুগে মুসলমানগণ যখন দিমাশক অবরোধ করেন, তখন হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রাযিঃ) বাবুল জাবিয়ার সম্মুখে ক্যাম্প স্থাপন করেন। পক্ষান্তরে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাযিঃ) এর বিপরীত দিকে দিমাশকের 'আল বাবুশ শারকির' সম্মুখে শিবির স্থাপন করেছিলেন। কয়েক মাস অবরোধ অব্যাহত থাকে। কয়েকবার সন্ধির আলোচনাও চলে, কিন্তু ব্যর্থ হয়। পরিশেষে হযরত খালিদ বিন ওলীদ (রাযিঃ) পূর্ব দিক থেকে আক্রমণ করেন এবং শহরের ভিতরে ঢুকে পড়েন। হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ)এর হযরত খালিদ (রাযিঃ)এর আক্রমণের কথা জানা ছিল না। বাবুল জাবিয়ার লোকেরা হযরত আবু উবাইদার সঙ্গে সন্ধি করে এই ফটক তাঁর জন্য উন্মুক্ত করে দেয়। হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) এই ফটক দিয়েই সন্ধির ভিত্তিতে শহরে প্রবেশ করেন। অপরদিক থেকে হযরত খালিদ (রাযিঃ) অসি

চালিয়ে সম্মুখে অগ্রসর হচ্ছিলেন, আর এদিক থেকে হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) শান্তি শৃংখলার সাথে আগমন করছিলেন। শহরের মধ্যখানে উভয়ের সাক্ষাত ঘটে। একে অপরকে দেখে বিস্ময়াভিভূত হন। হযরত খালিদ (রাযিঃ) বলেন ঃ আমি শহরের অর্ধেক অংশ তরবারীর জোরে জয় করেছি, এজন্য শহরের লোকদের সঙ্গে বিজিত শহরের ন্যায় আচরণ করা হবে। কিন্তু হযরত আবু উবাইদা (রাযিঃ) বলেন ঃ 'আমি সন্ধির ভিত্তিতে শহরবাসীকে নিরাপত্তা দান করেছি। যেহেতু অর্ধেক শহর সন্ধির ভিত্তিতে জয় হয়েছে তাই পুরো শহরের সঙ্গেই আমাদের সন্ধি অনুপাতে আচরণ করা দরকার। সুতরাং সাহাবায়ে কেরামের সর্বসম্মতিক্রমে এই সিদ্ধান্তই গৃহীত হয় যে, রক্তপাত আমাদের লক্ষ্য নয়, আল্লাহর কালিমা সমুচ্চ করাই আমাদের উদ্দেশ্য। তাই এই শহরকে আমরা সন্ধির ভিত্তিতে অর্জিত শহরই মনে করব।

বর্তমানে এখানে ফটক নামের কোন বস্তু অবশিষ্ট নেই। বরং এটি মধ্য শহরের ব্যস্ততম একটি সড়ক, যার উভয় দিকে ঘন জনবসতি। তবে বাবুল জাবিয়া নামের ফটকের সেই স্থানটি আজও সংরক্ষিত আছে। এটি আমীনে উম্মত হযরত আবু উবাইদা ইবনে জাররাহ (রাযিঃ)এর সেই পথ, যেখান দিয়ে তিনি বিজয়ী বেশে দিমাশকে প্রবেশ করেন। তাঁর হাতে এ ঐতিহাসিক শহর থেকে রোম সরকার কায়সারের প্রতাপের পতাকা একবার অবনমিত হলে দ্বিতীয়বার আর কোনদিন উঠতে পারেনি। তাঁর এবং তাঁর পবিত্র সঙ্গীদের হাতে ঈমান ও একীনের যেই প্রদীপ ছিল, তা দ্বারা তাঁরা এই ভূখণ্ডকে হেদায়েতের আলোতে আলোকিত করেন। সেসব পবিত্র আত্মাদের বিতরণকৃত নূরের প্রভাব সিরিয়াবাসীদের মধ্যে চৌদ্দশ' বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও অনুভূত হয়। কুফুরী ও ধর্মদ্রোহী শক্তি এই নূরকে নিভিয়ে দেওয়ার জন্য প্রাণান্তকর প্রচেষ্টা চালায়। এমনকি বর্তমানে ক্ষমতার লাগাম এই শ্রেণীর লোকেরাই হাতে নিয়েছে। কিন্তু আলহামদুলিল্লাহ! জনসাধারণের সিনায় ঈমানের যেই প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত রয়েছে, তা সম্পূর্ণরূপে নিভিয়ে ফেলতে তারা আজও সক্ষম হয়নি।

কাসিয়ুন পাহাড়ে

বাবুল জাবিয়াতে অতীতের কল্পনায় কয়েক মুহূর্ত বিভোর রইলাম। পরে কাসিয়ূন অভিমুখে যাত্রা করলাম। পাহাড়টি দিমাশক শহরের উপর এমনভাবে ছায়াপাত করে রেখেছে যেমন, ইসলামাবাদের উপর মারগালা পাহাড়। দিমাশকের জনবসতি বৃদ্ধি পেতে পেতে বর্তমানে এই পাহাড়ের অনেকাংশে ছড়িয়ে পড়েছে। সুতরাং অনেক জনপদ অতিক্রম করতে করতে আমরা ঐ সড়কে পৌঁছি, যা মোড় নিয়ে নিয়ে কাসিয়ুনের চূড়া অবধি পৌঁছেছে। সড়কটি ভূপৃষ্ঠ থেকে ক্রমশঃ উপরে উঠে গেছে। অল্প সময়ের মধ্যে আমরা পাহাড়ের চূড়ায় পৌঁছি।

ঐতিহাসিক এবং ইসরাইলী বর্ণনানুপাতে কাসিয়ূন আম্বিয়া (আঃ)এর কেন্দ্র ছিল। কোন কোন বর্ণনায় আছে, হযরত আদম (আঃ)এর ছেলে কাবিল তার ভাই হাবিলকে এখানেই হত্যা করেছিল। পাহাড়ে একটি গর্ত করা আছে। লোকে বলে সেখানে রক্তের চিহ্নও রয়েছে। জনসাধারণের মধ্যে প্রসিদ্ধ রয়েছে যে, এটি হযরত হাবিল এর রক্তের চিহ্ন।

এই পাহাড়ের উপর মসজিদে ইবরাহীম নামে একটি মসজিদ রয়েছে। কোন কোন বর্ণনায় জানা যায় যে, এ জায়গায় হযরত ইবরাহীম (আঃ) ইবাদত করতেন। এই মসজিদেরই বাহিরে পাহাড়ের মধ্যে একটি ফাটল রয়েছে। এ ফাটল সম্পর্কে বলা হয় যে, কুরআনে বর্ণিত হযরত ইবরাহীম (আঃ) সম্পর্কিত নিম্নোক্ত ঘটনাটি এখানেই ঘটেছিল।

তিনি প্রথমে তারকা তারপর চন্দ্র এবং পরে সূর্যকে (কাল্পনিকভাবে) খোদা সাব্যস্ত করেন। পরে এসব ধারণা থেকে তাঁর পবিত্রতার কথা প্রকাশ করে তাওহীদের আকীদার এই সূক্ষ্ম পদ্ধতিতে তাবলীগ করেন।

আরেকটি বর্ণনামতে হযরত ইলিয়াছ (আঃ) তৎকালীন বাদশাহর নির্যাতনে অতিষ্ঠ হয়ে এই পাহাড়েই আত্মগোপন করেছিলেন।

এসব বর্ণনা সনদের দিক থেকে দুর্বল। আর কতগুলো ঐতিহাসিকভাবে ভিত্তিহীন ও ভ্রান্ত। তবে একথা সুস্পষ্ট যে, এ পুরো অঞ্চল আম্বিয়াদের কেন্দ্রভূমি ছিল। কাসিয়ূন এ অঞ্চলের উৎকর্ষতম একটি পাহাড়। তাই বিভিন্ন নবী একে নিজেদের কেন্দ্ররূপে গ্রহণ করা

অস্বাভাবিক কিছু নয়।

পাহাড়ের একটি বিনোদন কেন্দ্রে গিয়ে আমাদের গাড়ী দাঁড়াল। গাড়ী থেকে নামার পর এমন এক মনোহরী দৃশ্য আমাদের সম্মুখে দেখতে পেলাম, যা ব্যক্ত করতে ভাষার আঁচল সংকীর্ণ মনে হচ্ছে। সম্মুখে তিন দিকেই দৃষ্টিসীমা পর্যন্ত দিমাশক নগরীর আলো ছড়িয়ে আছে। বিচিত্র রঙ্গের বাতিসমূহের এক জগৎ সৃষ্টি হয়েছে। মনে হচ্ছিল যেন পৃথিবী নক্ষত্রখচিত আকাশের রূপ ধারণ করেছে।

زمیں پہ جیسے کوئی کھکشاں اتر آئی

এখানে কয়েকটি রেস্তোরা রয়েছে। শিশুদের জন্য খেলার কয়েকটি জায়গা রয়েছে। সম্ভবতঃ প্রচণ্ড শীতের কারণে এখানে কোনরূপ কলধ্বনি ছিল না। আমরা কিছু সময় এখানকার সৌন্দর্যের লীলাভূমির রূপের আস্বাদন করে ফিরতি পথে যাত্রা করি।

শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ)

কাসিয়ূন পাহাড় থেকে অবতরণ করে আমরা দিমাশকের নতুন অঞ্চলে যাই। এ অঞ্চলকে 'দিমাশক আল জাদীদ' বলা হয়। প্রশস্ত সড়ক, বিস্তৃত ভবন এবং সুদৃশ্য বাংলোর দিক থেকে আধুনিক নগরায়নের এটি একটি উৎকৃষ্ট নমুনা। পরে এনায়েত সাহেব আমাদেরকে পুনরায় দিমাশকের প্রাচীন অঞ্চলের সেই মহল্লায় নিয়ে যান, যা শায়েখে আকবার মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবীর নামের সাথে সম্পৃক্ত। এখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত। এ সময় মাযার বন্ধ ছিল, বিধায় ভিতরে প্রবেশ করা সম্ভব হয়নি। তবে বাহির থেকেই ফাতেহা পাঠের সৌভাগ্য হয়।

হযরত শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ) সুফীগণের মধ্যে যে উচ্চ মাকামের অধিকারী ছিলেন, তা লেখাপড়া জানা কোন মানুষের অজানা নয়। ৫৬০হিজরীতে স্পেনের মারছিয়া শহরে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। পরে সেখান থেকে আশবিলীয়াতে স্থানান্তর হন। সেখানে তিনি একজন বাদশাহর দরবারে 'মুন্সি'র কাজ করতেন। কিন্তু পরে দুনিয়া বিরাগের প্রভাব প্রবল হয় এবং পার্থিব সকল কাজ ত্যাগ করে আল্লাহর

স্মরণে নিমগ্ন থাকেন। বাদশাহ তাঁকে একটি বাড়ী উপহার দিয়েছিলেন। বাড়ীটির মূল্য সে সময়ে ১ লক্ষ দিরহাম ছিল। কথিত আছে যে, একবার এক ভিক্ষুক তাঁর কাছে আসে। ভিক্ষুককে দেওয়ার মত কোন কিছু নিকটে না থাকায় তিনি ঐ বাড়ীটাই তাকে দান করে দেন।

শায়েখ আশবিলিয়া থেকে ভ্রমণ শুরু করে প্রথমে হজ্জের উদ্দেশ্যে মক্কা মদীনা গমন করেন। পরে মিসর, ইরাক এবং সিরিয়া ভ্রমণ করেন। মিসরে দীর্ঘদিন বসবাস করেন। সেখানে অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। তাঁর গ্রন্থসমূহে অনেক ব্যক্তিগত মত উল্লেখ করেন, ফলে মিসরের লোকেরা তাঁর শত্রু হয়ে যায়। এ কারণে তিনি বন্দীও হন। লোকেরা তাঁকে হত্যা করার জন্য তাঁর পিছে লাগে। অবশেষে আলী বিন ফাতাহ আল বাজায়ী তাঁর মুক্তির ব্যবস্থা করেন। অবশেষে তিনি দিমাশকে নিজের বাসস্থান বানান এবং ৬৩৮ হিজরীতে সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

হযরত শায়েখ মুহিউদ্দীন ইবনে আরাবী (রহঃ)এর ব্যক্তিত্ব আলেমদের নিকট বিতর্কিত ছিল। তাঁর কিতাবসমূহে যেসব 'শাতহিয়্যাত'[১] পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে অনেক মুহাদ্দিস এবং ফকীহ তাঁর উপর ক্ষুব্ধ এবং বিরূপ মন্তব্য করেছেন। কিন্তু অন্যান্য উলামায়ে কিরাম তাঁকে অপারগ (মাজুর) সাব্যস্ত করে তাঁর স্বপক্ষে তাঁর পবিত্রতার বিষয়ে অনেক গ্রন্থ রচনা করেছেন। আল্লামা জালালুদ্দীন সুয়ুতি (রহঃ) তার নির্দোষ হওয়ার বিষয়ে 'তাম্বীহুল গাবী বিতাবরিয়াতি ইবনি আরাবী' নামে স্বতন্ত্র একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তাতে আল্লামা সুয়ুতি (রহঃ) লেখেন ঃ

"আল্লামা ইবনে আরাবী (রহঃ) সম্পর্কে চূড়ান্ত কথা এই যে, তাঁর ওলী হওয়ার বিশ্বাস রাখবে। কিন্তু তাঁর গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা অবৈধ মনে করবে। কারণ তিনি নিজেই বলেছেন, আমি এমন ব্যক্তি যে, আমার গ্রন্থসমূহ অধ্যয়ন করা (আমার রুচি সম্পর্কে অনবহিত লোকদের

টীকা–১ ঃ শাতহিয়্যাত ঃ এটি একটি পারিভাষিক শব্দ। যা সুফিয়ায়ে কেরামের আল্লাহর প্রেমে বিভোর অস্বাভাবিক অবস্থায় (যখন তাদের স্বাভাবিক জ্ঞান লোপ পায়) তাদের যবানে উচ্চারিত শরী'অত বিরোধী কথাবার্তা বুঝানোর জন্য ব্যবহৃত হয়।

জন্য) অবৈধ। .... আর তার কারণ এই যে, সুফিয়ায়ে কেরাম এমন কিছু পরিভাষা নির্ধারণ করে রেখেছেন, যেগুলো দ্বারা তাঁরা ঐ সকল শব্দের পরিচিত অর্থ বাদ দিয়ে অন্য অর্থ গ্রহণ করেন। তাই কেউ যদি সেইসব শব্দের পরিচিত অর্থ গ্রহণ করে, তাহলে সে কাফের হয়ে যাবে। কথাটি ইমাম গাযযালী (রহঃ) ও তাঁর কোন কোন কিতাবে লিখেছেন।”

তিনি শায়েখ ইবনে আরাবী (রহঃ) সম্পর্কে অত্যন্ত ভারসাম্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত ব্যক্ত করেছেন। হাকীমুল উম্মত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী কুদ্দিছা ছিররুহু শায়েখ ইবনে আরাবী (রহঃ)এর নির্দোষ হওয়ার ব্যাপারে একটি পুস্তক রচনা করেছেন। পুস্তকটি ‘তাম্বীহুত্ তারাবি ফি তানযিয়াতি ইবনিল আরাবী’ নামে প্রকাশিত হয়েছে। তাতেও হযরত থানবী (রহঃ) প্রায় এই অবস্থানই গ্রহণ করেছেন।

আসল কথা এই যে, সুফিয়ায়ে কেরামের উপর যেসব অবস্থা ও ভাব আরোপিত হয়, তা এমন কোন ব্যক্তি যে এ অবস্থা অতিক্রম করেনি বুঝতে সক্ষম হয় না। তাই আমাদের মত লোকদের জন্য একথাই সত্য যে—

تو نہ دیدی گھے سلیمان را

چہ شنا سی زبان مرغاں را

তুমি কখনো সুলাইমানের দেখা পেলে না,
তাহলে তুমি পাখির ভাষা বুঝবে কি করে?

তাই এসকল বযুর্গ সম্পর্কে আমাদের কোনরূপ কুধারণা করার অবকাশ নেই। কেননা তাঁদের সমগ্র জীবন এত্তেবায়ে সুন্নাত দ্বারা গড়া ছিল। এমনিভাবে তাঁদের এ ধরনের গ্রন্থ অধ্যয়নেরও কোন আবশ্যকতা নেই। মানুষের নিজের সংশোধনের জন্য শরীয়ত ও সুন্নাত সম্বলিত অনেক গ্রন্থ রয়েছে। সেগুলোর হক আদায় করলেই যথেষ্ট। কন্টকাকীর্ণ এই গলিতে কেনই বা প্রবেশ করবে?

গ্রন্থাগারসমূহ

শায়েখ ইবনে আরাবী (রহঃ)এর মাযার থেকে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। সারাদিনের ক্লান্তির পর তাড়াতাড়ি ঘুম এসে যায়।

পরদিন কুতুবখানাসমূহ ঘুরে দেখার জন্য নির্ধারণ করে রেখেছিলাম। অন্যান্য সঙ্গীরা তাদের অন্য প্রয়োজনে চলে যায়। আর আমি দিমাশকের বিভিন্ন বাণিজ্যিক গ্রন্থাগারে ঘুরতে থাকি। এখানকার গ্রন্থাগারগুলো সত্যিই বিভিন্ন ধরনের কিতাবে পরিপূর্ণ। বৈরুত এর নিকটবর্তী হওয়ার কারণে এখানে গ্রন্থের উৎকৃষ্ট ভাণ্ডার সর্বদা মজুদ থাকে। বৈরুত আরবী কিতাবসমূহের মুদ্রণকেন্দ্র। অনেক বছর ধরে গৃহযুদ্ধের ধ্বংসলীলার শিকার হওয়া সত্ত্বেও সেখানে গ্রন্থ প্রকাশের কাজ নিত্য বৃদ্ধি পাচ্ছে। দিন রাত গোলাও ফুটছে এবং নতুন নতুন গ্রন্থও প্রকাশিত হচ্ছে। বৈরুত এখান থেকে খুব নিকটে হওয়ায় এখানে বৈরুত থেকে প্রচুর কিতাবপত্র আসতে থাকে, বরং বৈরুতের অনেক প্রকাশক তাদের একটি করে শোরুম দিমাশকেও প্রতিষ্ঠা করেছে। পূর্বে লিখেছি, সিরিয়ার মুদ্রা লীরার মূল্যমান পাকিস্তানী রুপির প্রায় সমান। এজন্য এখানে আমাদের জন্য এসব কিতাব খুব সস্তা হয়। মিসর, ইরাক এবং জর্দান প্রভৃতি রাষ্ট্রে কিতাবের এত বড় ভাণ্ডারও নেই এবং আমাদের জন্য তত সস্তাও নয়। তাই আমাদের অভিজ্ঞতা হল যে, কিতাব ক্রয়ের জন্য আরব দেশসমূহের মধ্যে এ স্থানটিই সর্বোৎকৃষ্ট।

সুতরাং সারাদিন আলমারীর ধুলি মন্থন করার পর সন্ধ্যা নাগাদ নিজের কাঙ্খিত গ্রন্থসমূহের বেশ বড় ভাণ্ডার জমা হল। বড় বড় কয়েক কার্টুনে তা ভরা হলো। আর এভাবেই আল্লাহর মেহেরবানীতে সফরের শ্রম স্বার্থক হলো।

এশার কিছু পূর্বে হোটেলে ফিরে আসি। সেখানে আমার দোস্ত শায়েখ আবদুল লতিফ আল ফারফুরকে অপেক্ষমান পেলাম। তিনি সিরিয়ার একজন প্রসিদ্ধ আলেম শায়েখ সালেহ আল ফারফুরের পুত্র। তিনি নিজেও একজন আলেম এবং রুচিসম্পন্ন আলেম। দাওয়াত ও তাবলীগের কাজে অনেক উদ্যমী। জিদ্দার মাজমাউল ফিকহীল ইসলামীতে সিরিয়ার প্রতিনিধিত্ব করেন। সৌদী আরব এবং আলজেরিয়া

প্রভৃতি দেশসমূহে তাঁর সঙ্গে অনেক সময় কাটিয়েছি। কুল্লিয়াতুশ শরইয়্যাহ এর কেউ কেউ অধমের আগমন সম্পর্কে তাঁকে সংবাদ দিলে তিনি হোটেলে চলে আসেন। অনেক সময় ধরে তিনি অপেক্ষা করছিলেন। আমাকে দেখে অনেক আনন্দিত হলেন এবং তাঁর সেখানে বুধবার দিনের নিমন্ত্রণ করলেন।

তিনি বিদায় হলে পাকিস্তানের কাউন্সিল জেনারেল জনাব তাওহীদ সাহেব আগমন করেন। তিনি দিমাশকের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকজন ব্যক্তির সঙ্গে সাক্ষাৎ করানোর জন্য আমাকে সঙ্গে নিয়ে যান। আমি আমার সাথীদেরকে বলে দিয়েছিলাম যে, ফিরতে দেরী হতে পারে। তাই খাওয়ার সময় আমার জন্য যেন অপেক্ষা না করে। তাওহীদ সাহেবের সঙ্গে বাস্তবিকই অনেক দেরী হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের কাজ শেষ হলে তাওহীদ সাহেব বললেন, এখানে কাছেই 'মাতআমে আবু কামাল' নামে খুব ভালো একটি রেস্তোরা রয়েছে। এখানকার খাবারগুলোও নাম করা। এখানে খানা খেয়ে নিন। সুতরাং আমরা রেস্তোরায় প্রবেশ করলাম। গিয়ে দেখি আমাদের সাথী ক্বারী বশীর আহমাদ সাহেব, মৌলভী আমীন আশরাফ সাল্লামাহু এবং মৌলভী আতাউর রহমান সাল্লামাহু পূর্ব থেকেই সেখানে বসা আছে। তাদের এই অভাবনীয় সাক্ষাতে অনেক আনন্দ হল।

সিরিয়ার খাবার স্বাদে ও মানে সমগ্র আরব দেশে প্রসিদ্ধ। বাস্তবেও খুব সুস্বাদু। রেস্তোরাটিও নয়নাভিরাম একটি স্থানে অবস্থিত। সেখান থেকে অনেক রাতে হোটেলে ফিরে আসি।

দারিয়ায়

পরদিন ভোরে আমরা দিমাশক শহরের উপকণ্ঠের 'দারিয়া' গ্রামে যাই। এটিও সিরিয়ার ঐতিহাসিক একটি গ্রাম। গ্রামটি দিমাশকের পশ্চিমে অবস্থিত। এ গ্রামটিও আম্বিয়ায়ে কেরাম (আঃ), সাহাবায়ে কেরাম (রাযিঃ) এবং আলেম ও ওলীদের কেন্দ্র ছিল। এখানে অনেক মহান ব্যক্তিত্ব জন্মগ্রহণ করেন। প্রাচীনকালে যারা দিমাশক ভ্রমণে আসত, তারা দারিয়ার ঐতিহাসিক গুরুত্বের কারণে সেখানেও যেত।

নবীদের মধ্য থেকে হযরত হিযকীল (আঃ)এর মাযার এখানে বলেই

প্রসিদ্ধ আছে। হযরত বেলাল হাবশী (রাযিঃ) জীবনের বিরাট একটি অংশ এই গ্রামে অতিবাহিত করেন। আল্লামা হামভী (রহঃ) যেসব আলেম এবং ওলী দারিয়ায় জন্মগ্রহণ করেছেন অথবা সমাধিস্থ হয়েছেন তাঁদের একটি দীর্ঘ তালিকা তৈরী করেছেন।

এটি ছোট একটি গ্রাম। সাদাসিধে, তবে সুন্দর সবুজ শ্যামল। আমাদের পথপ্রদর্শক বিভিন্ন সড়ক ও গলি অতিক্রম করে প্রশস্ত একটি গলিতে সুন্দর একটি মসজিদের সম্মুখে গাড়ী পার্ক করান।এটি খ্যাতনামা আল্লাহর ওলী হযরত আবু সুলায়মান দারানী (রহঃ)এর মাযার।

হযরত আবু সুলায়মান দারানী (রহঃ)

হযরত আবু সুলায়মান দারানী (রহঃ) (তাঁর নাম আবদুর রহমান ইবনে আহমাদ ইবনে আতিয়া আল আবাছী)। তিনি তাবে' তাবেঈনদের অন্যতম, অনেক বড় মুহাদ্দিস এবং উঁচু স্তরের আল্লাহর ওলী ছিলেন। তাঁর জন্ম হয় সিরিয়াতে। তারপর কিছুদিনের জন্য ইরাক গমন করেন। পরে আবার সিরিয়ায় অবস্থান করেন এবং এখানেই মৃত্যুবরণ করেন। বেশীর ভাগ সময় তিনি যিকির ফিকিরে লিপ্ত থাকতেন। তাঁর ওয়াজ উপদেশের ধারাও অব্যাহত ছিল। ইমাম আবু নাঈম ইস্পাহানী (রহঃ) ছাব্বিশ পৃষ্ঠাব্যাপী তাঁর আলোচনা করেছেন। তিনি সেখানে তাঁর অনেক বাণী উল্লেখ করেছেন। তার কয়েকটি এই—

১. তিনি বলেন ঃ যারা দুনিয়া থেকে পালায়, দুনিয়া তাদের পশ্চাদ্ধাবন করে। পলায়নকারীকে সে ধরতে পারলে আহত করে ছাড়ে। আর দুনিয়া অন্বেষণকারী তাকে ধরলে দুনিয়া তাকে হত্যাই করে ফেলে।

২. তিনি বলেন ঃ দুর্বল মানুষই অধিক ওয়াছওয়াছা এবং অধিক স্বপ্ন দেখে। ইখলাছ পরিপূর্ণ হলে স্বপ্ন এবং ওয়াছওয়াছা উভয়টি বন্ধ হয়ে যায়। অতঃপর নিজের সম্পর্কে বলেন ঃ অনেক সময় এমন হয় যে, কয়েক বছর অতিবাহিত হয়ে যায়। কিন্তু আমি কোন স্বপ্ন দেখি না।

৩. তিনি বলেন ঃ তোমাদের কারো কখনো কোন নফল ইবাদত ছুটে গেলে তাও কাজা করে নিবে। তাহলে ভবিষ্যতে আর ছোটার আশংকা থাকবে না।

৪. তিনি বলেন ঃ কোন কোন সময় পবিত্র কুরআনের একটি মাত্র আয়াত নিয়ে ভাবতেই আমার পাঁচ পাঁচটি রাত অতিবাহিত হয়ে যায়। আমি নিজের থেকে ঐ আয়াতের ভাবনা ত্যাগ না করলে সম্মুখে অগ্রসর হতে পারব না।

৫. একজন ছাত্র একবার হযরত আবু সুলায়মানকে বলে, বনী ইসরাঈলের উপর আমার ঈর্ষা হয়। তাদের জীবন দীর্ঘ হত, আর তারা এত অধিক ইবাদত করত যে, তাদের চামড়া সংকুচিত হয়ে পুরাতন মশকের মত হয়ে যেত। হযরত দারানী (রহঃ) বলেন, আল্লাহর কসম, আল্লাহ্ পাক আমাদের থেকে ইহা চাননা যে, আমাদের চামড়া হাড্ডির উপর শুকিয়ে যাক। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের থেকে একমাত্র বিশুদ্ধ নিয়্যত চান। আমাদের কোন ব্যক্তি যদি দশ দিনে বিশুদ্ধ নিয়্যত অর্জন করতে পারে, তাহলে সে ঐ মর্যাদা পাবে, যা বনী ইসরাঈলের কোন ব্যক্তি সারাজীবন সাধনা করে অর্জন করত।

৬. তিনি বলেন ঃ ইবাদত এ নয় যে, তুমি দু' পায়ে (নামাযে) দাঁড়িয়ে থাক, আর অন্য ব্যক্তি তোমার জন্য খাবারের ব্যবস্থা করুক। বরং প্রথমে নিজের খাবারের ব্যবস্থা কর, পরে ইবাদতে লিপ্ত হও।

মসজিদে প্রবেশ করার পর মসজিদের একদিকে হযরত দারনী (রহঃ)এর মাযার। আমরা মাযারে উপস্থিত হই। তাঁর পাশেই তাঁর স্ত্রী এবং তাঁর প্রসিদ্ধ সাগরিদ আহমাদ বিন আবিল হাওয়ারী সমাধিস্থ আছেন। আহমাদ বিন আবিল হাওয়ারী তাঁর সেই বিশিষ্ট সাগরিদ, যিনি তাঁর বেশীর ভাগ বাণী বর্ণনা করেছেন। তিনি উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন মুহাদ্দিসদের অন্যতম। ইমাম আবু দাউদ (রহঃ) এবং ইমাম ইবনে মাজাহ (রহঃ) তাঁর সাগরিদ।

হযরত আবু ছা'লাবা আল খুশানী (রাযিঃ)

হযরত আবু সুলায়মান দারানী (রহঃ)এর কবর থেকে অল্প দূরেই ছোট একটি কবরস্থান রয়েছে। তাতে দশ বারোটি কবর আছে। সেই কবরগুলোর মধ্য থেকে একটি কবর প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত আবু ছা'লাবা খুশানী (রাযিঃ)এর। তিনি বানু খুশাইন গোত্রের লোক ছিলেন। হুযূর

সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যখন খাইবারের যুদ্ধে যাওয়ার প্রস্তুতি গ্রহণ করছিলেন সে সময় তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে এসে মুসলমান হন এবং খাইবার যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। তিনি হুদায়বিয়ার সন্ধির সময় বায়াতে রিযওয়ানেও শামিল ছিলেন। হযরত আলী (রাযিঃ) এবং হযরত মুআবিয়া (রাযিঃ)এর মধ্যকার যুদ্ধে তিনি কারো সঙ্গ না দিয়ে পৃথক থাকেন। তিনি দারিয়ায় এসে বসবাস শুরু করেন। শেষ জীবনে বলতেন ঃ আল্লাহর নিকট আমি আশা করি যে, মৃত্যুর সময় আমার যাকান্দানির কষ্ট হবে না। সুতরাং একদিন শেষ রাত্রিতে তাহাজ্জুদ নামাযের মধ্যে সিজদা অবস্থায় তাঁর রুহ দেহ ত্যাগ করে। তাঁর মেয়ে তখন ঘুমিয়ে ছিলেন। ঘুমের মধ্যে তিনি স্বপ্নে দেখেন যে, তাঁর পিতা মারা গেছে। তিনি ভীত–সন্ত্রস্ত হয়ে জেগে ওঠেন এবং উচ্চস্বরে জিজ্ঞাসা করেন 'আমার পিতা কোথায়?' কেউ উত্তর করল ঃ তিনি নামায পড়ছেন। তখন সে তার পিতাকে ডাক দিল। কোন উত্তর না পেয়ে তিনি তাঁর কক্ষে চলে যান। সেখানে গিয়ে তাঁর পিতাকে সিজদারত দেখতে পান। তাঁকে নাড়া দিলে তিনি পড়ে যান। তখন বুঝতে পারেন যে, তাঁর মৃত্যু হয়েছে।

হযরত আবু সালাবা (রাযিঃ)এর মাযারের নিকটে একটি কবরে হযরত বেলাল হাবশী (রাযিঃ)এর নামও লেখা আছে। এমতে একটি বর্ণনাও রয়েছে যে, হযরত বেলাল (রাযিঃ)কে দারিয়ার কবরস্থানে দাফন করা হয়েছে এবং হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর দারিয়ায় বসবাস করার কথাও প্রমাণিত আছে। কিন্তু হাফেয ইবনে আসাকীর (রহঃ) প্রমুখের মত এদিকেই প্রবল যে, তাঁর মাযার দারিয়াতে নয় বরং দিমাশকের আল বাবুস সগীর কবরস্থানে। পূর্বে যার আলোচনা করেছি এবং তার সাথে হযরত বেলাল (রাযিঃ)এর পবিত্র আলোচনাও করা হয়েছে।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ)

এখানে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ)এর মাযারও প্রসিদ্ধ আছে। তাঁর নাম আবদুল্লাহ বিন ছাওব (রাযিঃ)। তিনি উম্মতে

মুহাম্মাদিয়ার (আঃ) সেই মহান বুযুর্গ ব্যক্তি, যার জন্য আল্লাহ পাক আগুনকে এমনভাবে নিষ্ক্রিয় করে দেন, যেমনভাবে নমরুদের আগুনকে হযরত ইবরাহীম (আঃ)এর জন্য উদ্যান বানিয়ে দেন। তিনি ইয়ামানে জন্মগ্রহণ করেন। হুযুর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জীবদ্দশাতেই ইসলাম গ্রহণ করেছিলেন কিন্তু তাঁর দরবারে উপস্থিত হওয়ার সুযোগ মেলেনি। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের পবিত্র হায়াতের শেষ অবস্থায় ইয়ামানে নবুওয়াতের মিথ্যা দাবীদার আসওয়াদে আনাসী এর উদ্ভব ঘটে। সে লোকদেরকে তার মিথ্যা নবুওয়াতের উপর ঈমান আনতে বাধ্য করত।

সে সময়েই সে হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ)কে সংবাদ পাঠিয়ে তার নিকট ডেকে নেয় এবং তার নবুওয়াতের উপর ঈমান আনার দাওয়াত দেয়। হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ) তা অস্বীকার করেন। তখন সে জিজ্ঞাসা করে ঃ তুমি কি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের উপর ঈমান রাখ? হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ) বললেন ঃ হাঁ।

একথা শুনে আসওয়াদে আনাসী একটি ভয়ঙ্কর অগ্নিকুণ্ড প্রজ্জ্বলিত করে এবং হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ)কে সে অগ্নিতে নিক্ষেপ করে। কিন্তু আল্লাহ পাক তাঁর জন্য আগুনকে নিষ্ক্রিয় করে দেন। তিনি তা থেকে সহীহ সালামতে বের হয়ে আসেন। এই ঘটনা এত বিস্ময়কর ছিল যে, আসওয়াদে আনাসী এবং তার সাথীদের উপর ভীতি ছড়িয়ে পড়ে। আসওয়াদের সঙ্গীরা তাকে পরামর্শ দেয় যে, একে দেশান্তর কর। অন্যথায় আশংকা রয়েছে যে, এর কারণে তোমার অনুসারীদের ঈমান নড়বড়ে হয়ে যাবে। সুতরাং তাঁকে ইয়ামান থেকে দেশান্তর করা হয়।

ইয়ামান থেকে বের হয়ে তাঁর আশ্রয়স্থল একটিই ছিল অর্থাৎ পবিত্র মদীনা। তাই তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দরবারে হাজির হওয়ার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু মদীনায় পৌছে জানতে পারলেন যে, রিসালাতের সূর্য অন্তরালে চলে গেছে। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করেছেন এবং হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) খলীফা হয়েছেন। তিনি মসজিদে নববীর দরজার নিকটে তাঁর

উট বসালেন এবং মসজিদের ভিতর এসে একটি খুঁটির পিছনে নামায পড়তে আরম্ভ করেন। হযরত উমর (রাযিঃ) সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনি ভিনদেশী এক মুসাফিরকে নামায পড়তে দেখে তাঁর নিকট এলেন। নামায শেষ হলে হযরত উমর (রাযিঃ) তাঁকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ

আপনি কোথা থেকে এসেছেন?

ইয়ামান থেকে। হযরত আবু মুসলিম উত্তর দিলেন।

হযরত উমর (রাযিঃ) সাথে সাথে জিজ্ঞেস করলেন আল্লাহর দুশমন (আসওয়াদে আনাসী) আমাদের এক বন্ধুকে আগুনে নিক্ষেপ করেছিল। কিন্তু আগুন তাঁর উপর কোন কাজ করেনি। পরে তাঁর সঙ্গে আসওয়াদ কিরূপ ব্যবহার করে?

হযরত আবু মুসলিম বললেন ঃ তার নাম আবদুল্লাহ বিন সাওব।

ততক্ষণে হযরত উমর (রাযিঃ)এর অন্তর্দৃষ্টি তার কাজ করেছে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে বললেন ঃ আমি আপনাকে কসম দিয়ে জিজ্ঞেস করছি, আপনিই কি সেই ব্যক্তি?

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ) উত্তর দিলেন ঃ জ্বি হাঁ।

হযরত উমর (রাযিঃ) একথা শুনে আনন্দ আতিশয্যে এবং গভীর ভালবাসায় তার ললাটে চুম্বন করলেন এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে হযরত আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ)এর দরবারে গেলেন। তাঁকে আবু বকর সিদ্দীক (রাযিঃ) এবং নিজের মাঝখানে বসালেন এবং বললেন, আল্লাহ তাআলার শোকর যে, তিনি আমাকে মৃত্যুর পূর্বে উম্মতে মুহাম্মাদিয়া সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের ঐ ব্যক্তিকে দেখালেন, যাঁর সঙ্গে আল্লাহ তাআলা ইবরাহীম খলীলুল্লাহ (আঃ)এর মত আচরণ করেছেন।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ) ইবাদত বন্দেগী এবং দুনিয়া বিমুখতায় অতুলনীয় ছিলেন। এটি তাঁর নিজেরই উক্তি যে, 'জান্নাতকে আমি খোলা চোখে দেখলেও আমার নিকট বাড়ানোর মত কোন আমল নাই। আর যদি জাহান্নামকে খোলা চোখে দেখি তবুও।' জিহাদেরও প্রচণ্ড আগ্রহ ছিল। জিহাদের সফরেও রোযা রাখতেন। জনৈক ব্যক্তি তাঁকে বলল ঃ সফরে রোযা রাখার দ্বারা আপনি খুব দুর্বল হয় পড়বেন। উত্তরে তিনি বললেন ঃ সেই ঘোড়াই গন্তব্যে পৌঁছতে পারে, যে হেঁটে হেঁটে দুর্বল

হয়ে যায়।

একবার তিনি বলেন, আলহামদুলিল্লাহ! আমি প্রাকৃতিক প্রয়োজন এবং স্ত্রীর নিকট নির্জন হওয়া ছাড়া এমন কোন কাজ করিনি, যে সম্পর্কে আমার দুঃশ্চিন্তা হবে যে, কেউ না দেখে ফেলে।

হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ) খুব বেশী গোলাম আযাদ করতেন। শেষে তাঁর নিকট একটি মাত্র দাসী রয়ে যায়। একদিন তাকে কাঁদতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে সে বলল ঃ আপনার ছেলে আমাকে মেরেছে। তিনি তাঁর ছেলেকে ডাকলেন এবং দাসীকে বললেন সে তোমাকে কিভাবে মেরেছে? দাসী বলল ঃ থাপ্পড় মেরেছে। তিনি বললেন ঃ তুমিও তাকে থাপ্পড় লাগাও। দাসী বলল ঃ আমি আমার মনিবকে মারতে পারি না। হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ) জিজ্ঞাসা করলেন ঃ তুমি কি তাকে মাফ করে দিয়েছ? সে বলল ঃ জ্বি হাঁ। তিনি বললেন ঃ দুনিয়া বা আখেরাতে কোথাও তোমার হক চাবে না তো? দাসী তা স্বীকার করল। হযরত আবু মুসলিম খাওলানী (রাযিঃ) বললেন ঃ দু'জন সাক্ষীর সম্মুখে স্বীকার কর। যখন দু'জন সাক্ষী এল এবং দাসী স্বীকার করল তখন তিনি বললেন ঃ আমিও এই সাক্ষীদের সামনে ঘোষণা করছি যে, এই দাসী আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য আযাদ। লোকেরা বলল ঃ আপনি মাত্র একটি থাপ্পড়ের কারণে দাসীকে আযাদ করে দিলেন? অথচ আপনার নিকট খিদমতের আর কেউ নেই। তিনি বললেন ঃ আরে বাদ দাও! আহা! যদি আমি সমান সমানে মুক্তি পেয়ে যাই। কারো হক আমার উপর রইল না এবং আমার হকও কারো উপর রইল না।

শেষ জীবনে তিনি সিরিয়ায় বসবাস শুরু করেন। এই দারিয়া গ্রামেই যথানিয়মে বসবাস করেন। কিন্তু জামে মসজিদে নামায পড়ার ফযীলত লাভের জন্য অধিকাংশ সময় তিনি দিমাশকে নামায পড়তে যেতেন। হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর খেলাফতের যুগে তিনি অনেক সময় তাঁর নিকট যেতেন। তাঁকে উপদেশ দিতেন। অনেক সময় কঠোর ভাষায়ও তাঁকে সতর্ক করতেন। কিন্তু হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) তাঁর প্রত্যেক কথাকে সীমাহীন গুরুত্ব দিতেন। লোকদেরকে তিনি বলে রেখেছিলেন, সে

যা কিছু বলুক তোমরা তাঁকে বাধা দিও না।

দারিয়ায় তিনি বাস করতেন, তাঁর কবর এখানেই আছে বলে একটি বর্ণনা পাওয়া যায়। আমাদের সম্মুখের এই কবরটি সেই বর্ণনা মোতাবেক তাঁরই, কিন্তু আরেকটি বর্ণনা এরূপ আছে যে, তিনি রোমানদের সাথে যুদ্ধের উদ্দেশ্যে রোমে চলে যান এবং সেখানেই তাঁর মৃত্যু হয়। মহান আল্লাহ সর্বজ্ঞ।

হযরত হিযকীল (আঃ)এর মাযারে

দারিয়ার এই ছোট কবরস্থান থেকে কিছু দূরে একটি বাড়ীর বহিরাঙ্গনে বিচ্ছিন্ন একটি কবর রয়েছে। এ কবর সম্পর্কে প্রসিদ্ধ আছে যে, এটি বনী ইসরাঈলের প্রসিদ্ধ নবী হযরত হিযকীল (আঃ)এর কবর। এ কবরটিও হযরত শুআইব (আঃ) এবং হযরত ইউশা (আঃ)এর কবরের মত, সাধারণ কবর থেকে অনেক বেশী লম্বা। সেখানেও উপস্থিত হওয়ার সৌভাগ্য হয়।

ঐতিহাসিক বর্ণনা মতে, হযরত হিযকীল (আঃ) হযরত মূসা (আঃ)এর তৃতীয় খলীফা ছিলেন। প্রথম খলীফা হযরত ইউশা (আঃ), দ্বিতীয় খলীফা হযরত কালিব বিন ইউহান্না এবং তৃতীয় খলীফা হযরত হিযকীল (আঃ)। বর্তমান বাইবেলের পুরাতন নিয়মে তাঁর নামে একটি সহীফা রয়েছে। পবিত্র কুরআনে তাঁর সম্মানিত নাম উল্লেখ নেই। কিন্তু পবিত্র কুরআনের সূরা বাকারায় একটি ঘটনা বর্ণিত হয়েছে। সে সম্পর্কে কোন কোন তাফসীরের বর্ণনা দ্বারা জানা যায় যে, ঐ ঘটনাটি তাঁরই সম্পর্কে।

হযরত আবদুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাযিঃ) এবং আরো কারো থেকে বর্ণিত আছে যে, একবার হযরত হিযকীল (আঃ) বনী ইসরাঈলের একটি জামাতকে বলেন ঃ অমুক শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাও। তখন তাঁরা মৃত্যুর ভয়ে পালিয়ে যায় এবং দূরবর্তী একটি প্রান্তরে গিয়ে তারা বসবাস শুরু করে এবং মনে করতে থাকে যে, আমরা এখন মৃত্যুর হাত থেকে নিরাপদে চলে এসেছি। আল্লাহ পাক তাদের এই আচরণ পছন্দ করলেন না। তাদের উপর মৃত্যু আরোপ করে দেওয়া হল। ফলে

তারা মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ল। এক সপ্তাহ পর হযরত হিযকীল (আঃ) সেই পথ দিয়ে যাওয়ার সময় তাদের এই অবস্থা দেখে দুঃখ প্রকাশ করলেন এবং দু'আ করলেন ঃ ইয়া ইলাহাল আলামীন ! তাদেরকে মৃত্যুর আযাব থেকে পরিত্রাণ দান করুন। যেন তাদের জীবন তাদের নিজেদের জন্য এবং অন্যদের জন্য শিক্ষাগ্রহণ এবং বোধোদয়ের কারণ হয়। পবিত্র কুরআন এই ঘটনাটিকে এভাবে ব্যক্ত করেছে—

اَلَمْ تَرَ اِلَى الَّذِيْنَ خَرَجُوْا مِنْ دِيَارِهِمْ وَهُمْ اُلُوْفٌ حَذَرَ الْمَوْتِ فَقَالَ لَهُمُ اللّٰهُ مُوْتُوْا ثُمَّ اَحْيَاهُمْ - اِنَّ اللّٰهَ لَذُوْ فَضْلٍ عَلَى النَّاسِ وَلٰكِنَّ اَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُوْنَ -

মিযযায়

দারিয়ার বিভিন্ন স্থান দেখা শেষ করে আমরা দিমাশকে ফেরার জন্য যাত্রা করি। শীতের দিন ছিল। যোহরের নামায সাড়ে এগারোটার নিকটবর্তী সময়ে পড়া হয়। আর আছরের আযান দেওয়া হয় আড়াইটার কাছাকাছি সময়ে, সুতরাং দিমাশকে প্রবেশ করার পর একটি মহল্লায় আমরা যোহর নামায আদায় করি। মহল্লাটির নাম 'মিয্যা' বলে জানতে পারলাম। বর্তমানে তো এটি দিমাশক শহরেরই একটি মহল্লা। কিন্তু শুরুতে এটি দিমাশকের বাহিরে একটি ভিন্ন গ্রাম ছিল। গ্রামটি রূপ-সৌন্দর্যে এবং সবুজ শ্যামলিমার জন্য প্রসিদ্ধ ছিল। এ সম্পর্কে আল্লামা হামভী (রহঃ) লেখেন—

"এটি দিমাশকের উদ্যানসমূহের মাঝে বড় একটি গ্রাম। গ্রামটি নিবিড় বৃক্ষ দ্বারা আচ্ছন্ন এবং দিমাশক থেকে অর্ধ ক্রোশ দূরে অবস্থিত।"

এই গ্রামে অনেক আলেম জন্মগ্রহণ করেন। তাদের মধ্যে সম্ভবতঃ হাফেয আবুল হাজ্জাজ মিযযী সর্বাধিক খ্যাতনামা ব্যক্তি। তৎপ্রণীত 'তাহযীবুল কামাল' গ্রন্থ সিহাহ সিত্তার আসমাউর রিজাল সম্পর্কে বর্তমানে সর্ববৃহৎ উৎসের মর্যাদা রাখে। হাফেয ইবনে হাজার (রহঃ) তার সংক্ষিপ্ত রূপ দিয়ে প্রথমে 'তাহযীবুত তাহযীব' এবং পরে 'তাকরীবুত তাহযীব' রচনা করেন। তাঁরই আরেকটি গ্রন্থ 'তুহফাতুল আশরাফ' সে

যুগের সিহাহ সিত্তার পূর্ণাঙ্গতম নির্ঘন্ট। হাফেয মিযযী (রহঃ) বড় বড় প্রখ্যাত আলেমদের ওস্তাদ। যাদের মধ্যে আল্লামা ইবনে তাইমিয়া, হাফেয যাহাবী, হাফেয সুবকী, হাফেয বারযাকী, আল্লামা ইবনে সায়্যিদুন নাছ এবং হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ)এর মত ব্যক্তিত্ব অন্তর্ভুক্ত। হাফেয ইবনে কাছীর (রহঃ) তো তাঁর জামাইও ছিলেন।

তাছাড়া মিযযা গ্রামের বড় বৈশিষ্ট্য এই যে, এটিকে প্রসিদ্ধ সাহাবী হযরত দিহইয়ায়ে কালবী (রাযিঃ)এর গ্রাম বলা হয় এবং এখানেই তাঁর মাযার অবস্থিত। আল্লাহর অনুগ্রহে সেই মাযারে হাজির হই।

হযরত দিহইয়ায়ে কালবী (রাযিঃ)

হযরত দিহইয়ায়ে কালবী (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সেসব সাহাবীদের অন্যতম ছিলেন, যাঁরা রূপলাবণ্যে যুগের অদ্বিতীয় ব্যক্তিত্ব ছিলেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে হযরত জীবরাঈল (আঃ)এর সদৃশ বলেছেন। হযরত জীবরাঈল (আঃ) মানুষের রূপে আসলে সাধারণতঃ হযরত দিহইয়ায়ে কালবী (রাযিঃ)এর রূপ ধরে আসতেন।

একবার হযরত আয়েশা (রাযিঃ) দেখেন যে, হযরত দিহইয়ায়ে কালবী (রাযিঃ) একটি ঘোড়ায় উপবিষ্ট আছেন, আর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সেই ঘোড়ার উপর হাত রেখে হযরত দিহইয়ায়ে কালবী (রাযিঃ)এর সঙ্গে কথা বলছেন। হযরত আয়েশা (রাযিঃ) হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট এই ঘটনা বর্ণনা করলে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন ঃ সে তো জীবরাঈল ছিল।

এক বর্ণনায় আছে যে, তিনি এত অধিক রূপ লাবণ্যের অধিকারী ছিলেন যে, তিনি কোন নতুন এলাকায় গেলে যুবতী মেয়েরা তাঁকে দেখার জন্য বাড়ীর বাইরে চলে আসত।

হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রোম সম্রাট কায়সারের নিকট দ্বীনের দাওয়াত দিয়ে যে পত্র লিখেছিলেন, তা তাঁর মাধ্যমেই পাঠিয়েছিলেন। এতে করে তিনি হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের দূত হওয়ার সৌভাগ্যও অর্জন করেন। তিনি কায়সারকে পত্র দিয়ে

মদীনায় ফেরার পথে সিরিয়া থেকে হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের জন্য কিছু পেস্তা, কিছু আঁখরোট এবং কাআক (রুটি বিশেষ), একটি পশমী জুব্বা এবং দুটি চামড়ার মোজা হাদিয়া স্বরূপ নিয়ে আসেন। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ সমস্ত উপঢৌকন গ্রহণ করেন এবং মোজাটি এত বেশী পরিধান করেন যে, তা ফেটে যায়।

হাদীস শরীফে এসেছে, একবার হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের নিকট মিসরের চিকন সুতার তৈরী কিবতীয়া নামক কয়েকটি কাপড় আসে। হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তার একাংশ হযরত দিহইয়াকে প্রদান করে বলেন ঃ একে দু'ভাগ করে একটি দ্বারা নিজের জন্য জামা বানিয়ে নিও এবং অপরাংশ তোমার স্ত্রীকে দিয়ে দিও। সে তা দ্বারা ওড়না বানিয়ে নিবে। হযরত দিহইয়া (রাযিঃ) কাপড় নিয়ে চলে যেতে লাগলেন। তখন হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তাঁকে পুনরায় ডেকে বললেন ঃ তোমার স্ত্রীকে বোলো, সে যেন এর নীচে এক পরত কাপড় লাগিয়ে নেয়। যেন কাপড়ের ভিতর থেকে শরীর ফুটে না ওঠে।

এসব ঘটনা দ্বারা তাঁর ওপর হুযূর সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের যেই বিশেষ স্নেহ ফুটে ওঠে, তা বর্ণনার অপেক্ষা রাখে না।

তিনি বদর যুদ্ধের পর প্রায় সকল যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেন। ইয়ারমুকের যুদ্ধেও তিনি শরীক ছিলেন। পরবর্তীতে মিযযায় অবস্থান করেন এবং সেখানেই মৃত্যুবরণ করেন।

উলামা সমাবেশ

মিয্যা থেকে আমরা হোটেলে ফিরে আসি। সন্ধ্যায় আমার কয়েকটি কুতুবখানায় যাওয়ার প্রোগ্রাম ছিল। সুতরাং এশা পর্যন্ত আমি বিভিন্ন কুতুবখানায় কিতাব ক্রয়ের কাজে ব্যস্ত থাকি। রাত্রিতে তাওহীদ সাহেব (কাউন্সিল জেনারেল, পাকিস্তান) তাঁর গৃহে অধমের সঙ্গে সাক্ষাত করানোর জন্য দিমাশকের নামকরা আলেমদেরকে নৈশভোজের দাওয়াত করেছিলেন। তাই এশার পর আমরা সেখানে যাই। সেখানে যেসব আলেম উপস্থিত ছিলেন, তাঁদের মধ্যে শায়েখ সাঈদ রমাযান আলুবতী,

ডঃ ফাতহী আদ দারিমী, শায়েখ ইবরাহীম আস সালকীনি, শায়েখ নূরুদ্দীন, ডঃ মুস্তফা আয যাহিলী (ডঃ ওয়াহবা আয যাহেলীর ভ্রাতা), শায়েখ আবদুল লতিফ আল ফারফুর প্রমুখ ব্যক্তিগণ শরীক ছিলেন। আমার এটা দেখে খুব আনন্দ হল যে, তাওহীদ সাহেব (তিনি মাশাআল্লাহ, ধর্মীয় উদ্দীপনাপূর্ণ একজন অফিসার) এখানকার সকল আলেমের সঙ্গে খুব ভাল সম্পর্ক সৃষ্টি করেছেন। আমাদের বহির্দেশের সকল দূতাবাসগুলোতে এমন উৎসাহী অফিসার থাকলে আমাদের সম্পর্কে সেই ব্যাপক অভিযোগ বিদূরিত হবে, যা আমাদের দূতাবাসগুলো সম্পর্কে সকলের মুখে মুখে রয়েছে।

যাই হোক মজমাটি খুব আনন্দপূর্ণ হয়। এখানে অনেক ইলমী বিষয় নিয়েও আলোচনা হয়। তাঁরা সকলে পাকিস্তানের অবস্থা শোনার জন্য বিশেষ করে এখানে শরীয়তের অনুশাসন বাস্তবায়নের প্রচেষ্টা সম্পর্কে জানার জন্য সীমাহীন আগ্রহী ছিলেন। সুতরাং অধম সংক্ষেপে পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার প্রেক্ষাপট, শরীয়ত বাস্তবায়নের জন্য আলেমদের প্রচেষ্টা এবং তার পরিণামের আলোকময় ও অন্ধকার দিক তাঁদের সামনে বর্ণনা করি। তাঁরা খুব মনোযোগ সহকারে এগুলো শ্রবণ করেন এবং প্রায় প্রত্যেকেই এই প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেন যে, আমাদের সকলের দৃষ্টি পাকিস্তানের উপর নিবদ্ধ আছে। আমরা মনে করি, একমাত্র পাকিস্তানই এমন একটি দেশ, যা শরীয়ত বাস্তবায়নের দৃষ্টান্ত কায়েম করার ক্ষেত্রে উজ্জ্বল ভূমিকা পালন করতে পারে। হায়! আমরা পাকিস্তানের বাসিন্দারা বাহিরের মুসলমানদের এসব আবেগের যদি মূল্যায়ন করতে পারতাম। হায়! আমাদের নিকট যদি তাঁদের দেওয়ার মত এই উত্তর থাকত যে, ইনশাআল্লাহ পাকিস্তানের অধিবাসীরা আপনাদের এই আশা পূর্ণ করবে। হায়! আমরা যদি তাঁদেরকে একথা বলার যোগ্য হতাম যে, মুসলিম বিশ্ব যে সুদিনের প্রতীক্ষায় রয়েছে, তার প্রভাত পাকিস্তানে উদয় হচ্ছে। কিন্তু বলা বাহুল্য যে, শুধু আকাংখার দ্বারা তিক্ত বাস্তবতার পরিবর্তন হতে পারে না। তাই এ জাতীয় প্রশ্নের উত্তরে আলোকময় দিকের সঙ্গে তিক্ত বাস্তবতাও বর্ণনা করতেই হয়। আল্লাহ জানেন, আর কতদিন আমাদেরকে এরূপ বলতে হবে।

ধর্মীয় দিক থেকে সিরিয়ায় যে অবস্থা বিরাজ করছে তা সকলেরই জানা ছিল। সে সম্পর্কেও আলোচনা হয়। কিন্তু তাঁরা এই বিষয়ে মন খুলে কথা বলার মত অবস্থাতেও আর নেই এবং পাকিস্তানের বর্তমান অবস্থাকেও তাঁদের দেশের অবস্থার ভিত্তিতে গনীমত মনে করে। আল্লাহ তাআলা স্বীয় দয়া ও অনুগ্রহে সিরিয়ার দ্বীনীমহলকে এ পরীক্ষা থেকে নিরাপদে পরিত্রাণ দান করেন। আমীন।

এশার পর থেকে রাত সাড়ে এগারোটা পর্যন্ত এই বৈঠক চলতে থাকে। তার পর আমরা হোটেলে ফিরে আসি।

দিমাশকের যাদুঘর

পরদিন ছিল দিমাশক অবস্থানের আমাদের শেষ দিন। সকালে নাস্তার পর সাথে সাথে আমরা দিমাশকের যাদুঘর দেখার প্রোগ্রাম বানিয়েছিলাম। যাদুঘর হোটেলের নিকটেই ছিল। তাই আমরা পায়ে হেঁটে রওয়ানা হই। ভিক্টোরিয়া কেন্দ্রীয় মহাসড়ক থেকে একটু সরে একটি গলির ভিতর দিয়ে যেতে হয়। গলিটি বর্তমানে হস্তনির্মিত ফার্নিচার ও কুটির শিল্পের কেন্দ্র। এই গলির মাঝখানে তুর্কি যুগের নির্মিত একটি প্রাচীন ভবন রয়েছে। এটি তুর্কি খেলাফতকালে বড় একটি মাদ্রাসা ছিল বলে জানতে পারি। ভবনটি যদিও পুরাতন হয়েছে, কিন্তু তার সৌন্দর্য ও জাঁকজমক এখনও পর্যন্ত অটুট রয়েছে। এর প্রধান ফটক দিয়ে প্রবেশ করলে সম্মুখে বিস্তৃত একটি আঙ্গিনা রয়েছে। তার উভয় দিকে বারান্দা এবং বারান্দার ভিতরে কক্ষের সারি। অনুমানে মনে হল এ কক্ষগুলো ছাত্রাবাসরূপে ব্যবহৃত হত। আঙ্গিনার ওপারে কয়েকটি বড় বড় হল রয়েছে। সেগুলো সম্ভবতঃ শ্রেণীকক্ষরূপে ব্যবহৃত হত।

যদিও এই ভবন আজ বিরান পড়ে আছে এবং কোন কোন কক্ষে ফার্নিচার বিক্রেতাগণ তাদের গুদাম বানিয়েছে, কিন্তু আজও তার দরজা ও প্রাচীর থেকে ইলমের সুঘ্রাণ অনুভূত হয়। আল্লাহ জানেন এখানে কতকাল যাবত কত বড় বড় আলেমের ফয়েয বিতরণ অব্যাহত ছিল। কিন্তু আজ এই মাদ্রাসার নাম এবং তার ইতিহাস বলারও কোন লোক বিদ্যমান নেই।

مَا عِنْدَكُمْ يَنْفَدُ وَ مَا عِنْدَ اللّٰهِ بَاقٍ

"তোমাদের নিকট যা আছে, তা শেষ হয়ে যাবে। আর আল্লাহর নিকট যা আছে, তা চিরকাল থাকবে।"

মাদ্রাসা থেকে বের হয়ে আমরা পুনরায় কেন্দ্রীয় সড়কে চলে আসি। সড়কের কাছেই জাদুঘরের বিশাল ভবন দাঁড়িয়ে। ধারণা করেছিলাম, দিমাশক অত্যন্ত প্রাচীন শহর। তাই এখানকার যাদুঘর নিশ্চয়ই প্রাচীন ঐতিহাসিক বস্তু দ্বারা পরিপূর্ণ থাকবে। কিন্তু ভিতরে প্রবেশ করে বুঝতে পারলাম, এটি সাধারণ শহরগুলোর প্রচলিত যাদুঘর থেকে ভিন্নতর নয়। বনু উমাইয়ার কয়েকজন খলীফা (আবদুল মালেক বিন মারওয়ান এবং হিশাম বিন আবদুল মালেক)এর বর্ম এবং তরবারী ছাড়া এখানে বিশেষ মনোমুগ্ধকর কোন বস্তু নেই। যাদুঘর বেশীর ভাগ বাইজেন্টাইন যুগের স্মরণীয় জিনিস দ্বারা ভরা। যা আমাদের মুগ্ধ হওয়ার বিশেষ কিছু নয়।

সেদিন দুপুরে আমাদের দোস্ত শায়েখ আবদুল লতীফ আল ফারফূর সাহেব আমাদেরকে মধ্যাহ্ন ভোজের দাওয়াত করেছিলেন এবং প্রায় দশটার সময়ই তাঁর এক ছাত্রকে আমাদের নিকট পাঠিয়েছিলেন, যেন সে শহরের কাজে আমাদের সাহায্যও করতে পারে এবং পরে আমাদেরকে খাবার স্থলে নিয়ে যেতে পারে।

হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর মাযারে

সুতরাং তার সাথে প্রথমে আমরা দিমাশকের জামে মসজিদ এবং হামিদিয়া বাজারের আশপাশ থেকে কিছু কেনাকাটা করি। সিরিয়ার পুরাতন ধাচের মিষ্টি এখানকার উল্লেখযোগ্য বস্তু। যেগুলো শুকনো ফল দ্বারা বিভিন্ন পদ্ধতিতে বানানো হয়। তা ক্রয় করা হলো। এ সময় আমাদের পথপ্রদর্শক বললেন, হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর মাযারও এই এলাকার একটি গৃহে রয়েছে। সুতরাং তিনি আমাদেরকে কয়েকটি পেঁচানো গলিপথ ঘুরিয়ে পুরাতন ধাচের জীর্ণ–শীর্ণ একটি গৃহের নিকট নিয়ে যান। দরজায় আওয়াজ দিলে ভিতর থেকে বৃদ্ধা এক মহিলা সাড়া দিল। আমাদের পথপ্রদর্শক তাকে বললেন ঃ পাকিস্তান থেকে কিছু লোক

এসেছে। তারা মাযার যিয়ারত করতে চায়। মহিলাটি বলল ঃ এর জন্য ওয়াকফ বিষয়ক অধিদপ্তর থেকে অনুমতিপত্র নিয়ে আসতে হবে।

পরে জানতে পারি যে, সরকার আইন করে সাধারণের জন্য এই মাযার যিয়ারত বন্ধ করে দিয়েছে। কারণ এই যে, শিয়াপন্থী কিছু কিছু লোক এখানে এসে বেআদবী করে এবং মাযারের মানহানিকর কাজ করত। তাই ওয়াকফ বিষয়ক অধিদপ্তর আইন করেছে যেন অনুমতিপত্র ছাড়া কাউকে ভিতরে প্রবেশ করতে দেওয়া না হয়।

কিন্তু আমাদের সঙ্গে পাকিস্তান দূতাবাসের এনায়েত সাহেবও ছিলেন। তিনি এবং আমাদের পথপ্রদর্শক উভয়ে মিলে মহিলাটিকে নিশ্চিন্ত করার প্রয়াস পান এবং অধমের পরিচয় তুলে ধরেন। এতে করে মহিলাটি ভিতরে যাওয়ার অনুমতি দেয়।

এটি পুরাতন ধাঁচের একটি গৃহ, যার দীর্ঘ আঙ্গিনা অতিক্রম করে বড় একটি কামরা দেখতে পাই। তাতে কয়েকটি কবর রয়েছে। এর মধ্য থেকে একটি কবর হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এরও বলা হয়। এখানে সালাম নিবেদন করার তাওফীক হয়।

হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর রাজনৈতিক অবস্থান হযরত আলী (রাযিঃ)এর বিপক্ষে ছিল। জামহুর আহলে সুন্নাত এর মতে হযরত আলী (রাযিঃ) হকের উপরে ছিলেন। তাই বিরুদ্ধবাদীরা বিশেষ করে শিয়ারা হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর বিরুদ্ধে প্রোপাগাণ্ডা করার সুযোগ পেয়ে যায়, তাঁর বিরুদ্ধে দোষারোপ ও অপবাদের স্তূপ লাগিয়ে দেয়। সেই স্তূপে তাঁর মর্যাদা এবং গুণাবলী ঢাকা পড়ে যায়। অন্যথায় তিনি একজন মহিমান্বিত সাহাবী, কাতেবে ওহী এবং এমন প্রশংসনীয় গুণাবলীর অধিকারী ছিলেন, যা আজ কল্পনা করাও সম্ভব নয়। এজন্যই যখন হযরত আবদুল্লাহ ইবনে মুবারক (রহঃ)কে জিজ্ঞাসা করা হয় যে, হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) উত্তম নাকি উমর ইবনে আবদুল আজিজ (রহঃ)? তখন তিনি উত্তর দেন ঃ হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর নাকের ধুলিও উমর বিন আবদুল আজিজ (রহঃ) থেকে উত্তম। অধম তাঁর বিরুদ্ধে লাগানো আপত্তিসমূহ সম্পর্কে ['হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ) আওর তারিখী হাকায়েক' (ইতিহাসের কাঠগড়ায় হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)] গ্রন্থে

বিস্তারিত আলোচনা করেছি এবং আমার ভ্রাতুষ্পুত্র স্নেহের মাওলানা মাহমূদ আশরাফ উসমানী হযরত মুয়াবিয়া (রাযিঃ)এর চরিত ও অনুপম গুণাবলী সম্পর্কে একটি পৃথক প্রবন্ধ লিখেছে, তা এ গ্রন্থের সাথেই প্রকাশিত হয়েছে।

আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ)

দিমাশক থাকাকালে যেসব কাজের প্রোগ্রাম ছিল, আলহামদুলিল্লাহ তার প্রায় সবগুলোই পুরা হয়েছে। তবে একটি বাসনা এখনও অপূর্ণ রয়েছে। আল্লামা ইবনে আবেদীন শামী (রহঃ)এর সাথে আমাদের মত তালেবে ইলমদের হৃদয়ের যে সম্পর্ক রয়েছে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। তাঁর লিখিত 'রদ্দুল মুহতার' গ্রন্থ বর্তমানে হানাফী মুফতীদের সর্ববৃহৎ উৎসগ্রন্থ। যা দ্বারা দিন-রাত উপকৃত হতে হয়। মনে বাসনা ছিল, তাঁর মাযারেও হাজির হব। কিন্তু এনায়েত সাহেব যিনি এ পর্যন্ত আমাদের পথ প্রদর্শন করে আসছিলেন, তাঁর মাযারের স্থান সম্পর্কে অবগত ছিলেন না। তখন শায়েখ ফারফুরের এই ছাত্র, যাকে আজ আমরা পেলাম জানাল যে, সে মাযার সম্পর্কে অবগত আছে।

সুতরাং হামিদিয়া বাজার থেকে আমরা আরেকবার আল বাবুস সগীর এর কবরস্থানে যাই। সেখানে কবরস্থানের কেন্দ্রীয় ফটকের বামদিকে ছোট একটি চৌহদ্দী রয়েছে। তার পৃথক একটি দরজাও রয়েছে সেখানে আল্লামা শামী (রহঃ) এবং তার পরিবারের সদস্যরা বিশ্রামরত আছেন।

সর্বপ্রথম আমরা আল্লামা শামীর মাযারে হাজির হই। ভক্তি ও ভালবাসার আবেগ আপ্লুত হৃদয়ে সালাম পেশ করার এবং ইসালে সওয়াব করার সুযোগ ঘটে।

আল্লামা শামীর নাম মুহাম্মদ আমীন ইবনে আবেদীন (রহঃ)। ১১৯৮ হিজরীতে তিনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁর পিতা একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। তিনি বাল্যকালে পবিত্র কুরআন হিফয করেন। হিফয শেষ করার পর তাঁর পিতা তাকে ব্যবসা শেখানোর জন্য দোকানে বসাতে আরম্ভ করেন। তিনি সেখানে বসে উচ্চস্বরে কুরআন তেলাওয়াত করতেন। একদিন বসে বসে তেলাওয়াত করছিলেন, তখন সেখান দিয়ে একজন অপরিচিত

লোক যাচ্ছিল। সেই লোক তাঁকে কুরআন পড়তে দেখে বলল ঃ এভাবে কুরআন পড়া দুই কারণে তোমার জন্য জায়েয নাই। প্রথম কারণ এই যে, এটি বাজার। এখানে লোকেরা তোমার তেলাওয়াত শুনতে পারবে না। আর তোমার কারণে তারা গুনাহগার হবে। যার গুনাহ তোমারও হবে। দ্বিতীয় কারণ এই যে, তোমার তেলাওয়াতে অনেক ভুল রয়েছে।

তখনই আল্লামা শামী (রহঃ) দোকান থেকে উঠে পড়েন এবং সে যুগের শাইখুল কুররা শায়েখ সাঈদ আল হামভী (রহঃ)এর নিকট চলে যান এবং তাঁর নিকট কিরাআত ও তাজবীদ শেখার জন্য দরখাস্ত করেন। তিনি দরখাস্ত মঞ্জুর করেন। আল্লামা শামী (রহঃ) নাবালেগ অবস্থাতেই কিরাআত ও তাজবীদের গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ 'মায়দানিয়া' 'জাযরিয়া' এবং 'শাতেবিয়া' মুখস্থ করে ফেলেন এবং কিরাআত ও তাজবীদ বিষয়ে দক্ষতা অর্জন করেন।

এই ঘটনার পর হতে তিনি ইলমের স্বাদ পেয়ে যান। সুতরাং তিনি দ্বীনী ইলমের সকল বিষয়ে সে যুগের বড় বড় ওস্তাদদের নিকট জ্ঞানার্জন করেন। তারপর গ্রন্থ রচনা ও সংকলনের কাজে ব্যাপৃত হন। তিনি অনেক গ্রন্থ রচনা করেন। ফিকহে হানাফী ছিল তাঁর বিশেষ বিষয়বস্তু। ফলে তাঁর বেশীর ভাগ কিতাব হানাফী ফেকাহ সংক্রান্ত। তার মধ্যে 'আদদুররুল মুখতার' গ্রন্থের ভাষ্যগ্রন্থ 'রদ্দুল মুহতার' যা ফতোয়া শামী নামে প্রসিদ্ধ, সর্বাপেক্ষা পূর্ণাঙ্গ এবং বিশদ আকারের। দ্বাদশ হিজরী শতাব্দীর পর গ্রন্থটি হানাফী মাযহাবের মুফতীগণের সর্ববৃহৎ উৎসের রূপ লাভ করে। কারণ, ফিকহে হানাফীর গবেষণা ও প্রচ্ছন্নের কাজে এটি একটি তুলনাহীন গ্রন্থ। এতে আল্লামা শামী (রহঃ) একেকটি মাসআলার গবেষণায় অসংখ্য কিতাব অধ্যয়ন করেন এবং শুধুমাত্র পরবর্তীদের উদ্ধৃতির উপর নির্ভর না করে মূল উৎস থেকে সকল মাসআলা যাচাই করেন।

ফেকাহ এবং ফতওয়া বিষয়ে আল্লামা শামী (রহঃ) সম্ভবতঃ সে যুগের সর্ববৃহৎ লক্ষ্যস্থল ছিলেন। ইবাদত বন্দেগী এবং উত্তম চরিত্রের ক্ষেত্রেও তাঁর ছিল উচ্চাসন। সর্বদা উযূ সহকারে থাকতেন। রমাযান শরীফের প্রতি রাতে এক খতম কুরআন পাঠের অভ্যাস ছিল। ব্যবসার

কাজ তাঁর এক অংশীদারের উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। ব্যবসাই তার আয়ের উৎস ছিল। নিজে ইলম আমলের কাজে ব্যস্ত থাকতেন। খুব বেশী দান-খয়রাত করতেন। তাঁর ইলমের প্রভাবে যুগের শাসকরাও প্রভাবিত ছিল। বিচারপতি শরীয়ত পরিপন্থী কোন রায় দিলে আর আল্লামা শামী (রহঃ) তাঁর ফতওয়ায় এই রায়কে শরীয়ত বিরোধী সাব্যস্ত করলে বিচারপতির সে রায় পরিবর্তন করতে হত।

আল্লামা শামী (রহঃ) সর্বমোট ৫৪ বছর বয়স পান। তিনি ১২৫২ হিজরীতে ইন্তেকাল করেন। মৃত্যুর প্রায় বিশ দিন পূর্বে তিনি তাঁর কবরের জায়গা নিজেই মনোনীত করেন। কারণ সে জায়গায় দুররে মুখতার গ্রন্থ প্রণেতা আল্লামা হাছকাফী (রহঃ) সমাধিস্থ ছিলেন। আল্লামা শামী (রহঃ) তাঁর নিকটেই কবরস্থ হতে চাইতেন। সুতরাং তাঁর অসীয়ত অনুপাতে তাঁকে সেখানেই দাফন করা হয়।

তাঁর মৃত্যুর সময় তাঁর মাতা জীবিত ছিলেন এবং পরে আরও দু' বছর বেঁচেছিলেন। তিনি অত্যন্ত আল্লাহ ওয়ালী মহিলা ছিলেন। তাঁর বংশ পরম্পরা প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিস আল্লামা দাউদী (রহঃ)এর সঙ্গে মিলিত হয়। তাঁর যোগ্য সন্তানের মৃত্যুতে তিনি সাধারণ মহিলাদের মত একেবারে অস্থির অশান্ত হননি। তবে যতদিন বেঁচেছিলেন ততদিন প্রতি সপ্তায় একলক্ষ বার সূরা এখলাছ পড়ে নিজের প্রিয় ছেলের নামে ঈসালে সওয়াব (সওয়াব প্রেরণ) করতেন।

আল্লামা শামী (রহঃ)এর পৌত্র মুফতী আবুল ইউছর কয়েক বছর পূর্বেও জীবিত ছিলেন। আমার শ্রদ্ধেয় পিতা হযরত মাওলানা মুফতী মুহাম্মদ শফী সাহেব কুদ্দিসা সিররুহ যখন দিমাশক সফর করেন, তখন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতও হয়েছিল।

আল্লামা শামী (রহঃ)এর কবরের সম্মুখেই হানাফী ফেকাহর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ 'আদ্দুররুল মুখতার' এর লেখক আল্লামা মুহাম্মদ আলাউদ্দীন হাছকাফী (রহঃ)এর মাযার আল্লামা শামী (রহঃ) তাঁর এই গ্রন্থের ব্যাখ্যা করেন। ১০৮৮ হিজরীতে আল্লামা হাছকাফী মৃত্যুবরণ করেন।

তার নিকটেই আল্লামা শামী (রহঃ)এর গুণবান সন্তান আল্লামা আলাউদ্দীন ইবনে আবেদীন (রহঃ)এর মাযার। তিনি হানাফী ফেকায়

পিতার যথার্থ উত্তরাধিকারী ছিলেন। তিনি তাঁর পিতার লিখিত রদ্দুল মুহতার গ্রন্থের তাকমিলা (উপসংহার)ও লিখেছেন। তুরস্কের খেলাফতে উসমানিয়া যখন আদালতের জন্য হানাফী ফেকাহ্‌র ভিত্তিতে ইসলামী আইন প্রণয়নের কাজ শুরু করে, তখন আল্লামা আলাউদ্দীন (রহঃ)এর নেতৃত্বে একাজ সম্পাদনের জন্য আলেমদের একটি কমিটি গঠন করা হয়। তাঁরা 'মাজাল্লাতুল আহকাম আল আদলিয়া' নামে একটি আইন প্রণয়ন করেন। এই আইন শুধু তুরস্কের নয়, বরং অনেকগুলো মুসলিম দেশে বহু বছর যাবত চালু থাকে। কুয়েত এবং জর্দান প্রভৃতি দেশসমূহে কয়েক বছর পূর্ব পর্যন্ত রাষ্ট্রীয় আইনরূপে উক্ত মাজাল্লা চালু ছিল।

আল্লামা আলাউদ্দীন (রহঃ) ত্রিপলী (লেবানন)এর বিচারপতিও ছিলেন এবং দিমাশকের মাজলিছুল মাআরিফের সভাপতিও ছিলেন। নূরুল ইযাহ–এর ভাষ্যগ্রন্থ মিরাজুন নাজা ও তাঁর রচনাবলীর অন্তর্ভুক্ত।

বুযুর্গত্রয়ের মাযারে ফাতেহা পাঠ শেষ করে আমরা শায়েখ আবদুল লতীফ আল ফারফুর এর ওখানে খাবার খেতে উপস্থিত হই। আরব দেশগুলোর মধ্যে খানাপিনার বিষয়ে সিরিয়ার লোকদের স্বাদ–রুচি সর্বোৎকৃষ্ট। এখানকার খাদ্য সমগ্র আরবদেশে প্রসিদ্ধ এবং উন্নতমানের। শায়েখ ফারফুর শামী সিরিয়ার উন্নতমানের খাবারের সমাহার ঘটান। খাবারের বৈঠকটিও মনোমুগ্ধকর ছিল। খাওয়া শেষ করতে করতে আছরের সময় হয়ে যায়। আসরের নামাযের পর আমরা হোটেলে চলে আসি।

হোটেলে এসে দিমাশক বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রভাষক শায়েখ নূরুদ্দীন এবং শায়েখ ইবরাহীম আস্ সালকীনীকে আমার জন্য অপেক্ষমান পেলাম। তাঁরা বিদায়ী সাক্ষাতের জন্য এসেছিলেন। তাঁরা উভয়ে তাঁদের লিখিত গ্রন্থসমূহ হাদিয়াস্বরূপ দিলেন। মাগরিব পর্যন্ত তাঁদের সঙ্গে কথাবার্তা চলে।

আমি রাত বারোটায় দিমাশক থেকে করাচীর প্লেনের সিট বুক করে রেখেছিলাম। অন্যান্য সঙ্গীরা (ক্বারী বশীর আহমদ সাহেব, মৌলভী আমীন আশরাফ সাহেব এবং মৌলভী আতাউর রহমান সাহেব) প্রাইভেট কারে মদীনা তায়্যিবা ফিরে যাবেন। কিন্তু এশার পর জানতে পারি যে, প্লেন

ছাড়তে দেরী হবে। কিন্তু ছাড়ার নির্ধারিত সময় অনেক রাত পর্যন্ত জানতে পারলাম না। এই সময়ে পাকিস্তানী দূতাবাসের ডিফেনস এটাচী, যিনি আমাদের এখানে অবস্থানকালে কোন এক কাজ নিয়ে দিমাশকের বাহিরে গিয়েছিলেন, তিনি ফিরে এসে আমাদের সঙ্গে সাক্ষাত করার জন্য হোটেলে চলে আসেন এবং খুব পীড়াপীড়ি করে রাতে খানা খাওয়ার জন্য তাঁর বাড়ীতে নিয়ে যান। সেখানে তাওহীদ সাহেবও উপস্থিত ছিলেন। রাত এগারোটায় সেখান থেকে ফিরে আসি। বারোটার কাছাকাছি সময়ে জানতে পারি যে, ভোর পাঁচটায় প্লেন ছাড়বে। সুতরাং সে রাত প্রায় জাগ্রত অবস্থায়ই কেটে যায়। ভোর প্রায় সাড়ে তিনটায় এনায়েত সাহেব আমাদের নেওয়ার জন্য আসেন। আমরা দিমাশক এয়ারপোর্টে চলে যাই। ভোর হতেই প্লেন রওনা করল এবং আম্মানের পথ হয়ে প্রায় পাঁচ ঘন্টায় শান্তি ও নিরাপদে দেশে ফিরে এলাম। আলহামদুলিল্লাহ।

সার্বিক প্রতিক্রিয়া

উহুদ পাহাড় থেকে কাসিয়ুন পাহাড় পর্যন্তের এই সফর আমার অত্যন্ত স্মরণীয় সফরসমূহের অন্যতম। এর প্রতিটি ধাপ মনোমুগ্ধকর, কল্যাণকর ও বরকতপূর্ণ প্রমাণিত হয়েছে। এই সফরের মাধ্যমে নবীগণের (আঃ) ও সাহাবীদের এই ভূখণ্ড দেখার বাসনা পূর্ণ হয়।

ইল্‌ম এবং ধর্মীয় দিক থেকে সিরিয়া আলমে ইসলামের অতীব গুরুত্বপূর্ণ ভূখণ্ড। এখানে ইলম এবং দ্বীনের ঐতিহ্যাবলী পূর্ণ প্রতাপ সহকারে প্রতিষ্ঠিত হয় এবং টিকে থাকে। এখানকার মানুষের চরিত্র মাধুরী ইসলামের অনুপম চরিত্রের আদর্শ মনে করা হত। তাদের প্রতিটি কাজ পরিচ্ছন্ন এবং হৃদয়গ্রাহী ছিল। এমনকি সাম্রাজ্যবাদের যুগেও সিরিয়ার এই ঐতিহ্য অনেকাংশে টিকে আছে। কিন্তু যখন থেকে এখানে বাথপার্টি এবং বিশেষতঃ হাফেয আল আসাদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন থেকে সে এখানকার দ্বীনী মহলের জন্য জীবন যাপন সংকীর্ণ করে দেয়। হাফেয আল আসাদ বিশ্বাসগতভাবে নুছাইরী সম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত। তারা শিয়াদের অত্যন্ত চরমপন্থী একটি দল। রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক দর্শনে কমিউনিজমকে সে তার আদর্শ মনে করে। এই সরকার

সমগ্র দেশকে একটি বিস্তৃত কয়েদখানায় পরিণত করে এখানকার অতীব গুরুত্বপূর্ণ ও মর্যাদাশীল আলেমদেরকে এবং মুসলমানদেরকে এত বেশী কষ্ট দেয় যে, তাঁদের বিরাট সংখ্যক লোককে দেশান্তর হতে হয়। বর্তমানে সিরিয়ার অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিত্বই বিভিন্ন মুসলিম দেশে দেশান্তরের জীবন যাপন করছে। কিছুদিন পর পর বিরতি দিয়ে সরকারের ধর্মীয় মহলকে ছাটাই করার পালা শুরু হয়। তখন শত শত বরং হাজার হাজার মুসলমান মৃত্যুর গ্রাসে অথবা অমানবিক নির্যাতনের লক্ষ্যস্থলে পরিণত হয়। হামা শহরে আলেমদেরকে যেভাবে গণহত্যা করা হয়, তার কল্পনা করতেও শরীর শিউরে ওঠে।

বছরের পর বছর ধরে যখন দ্বীনী মহলের গলা চিপে ধরা হয়েছে এবং ইসলাম বিদ্বেষী শক্তিসমূহ পূর্ণোদ্যমে কর্মব্যস্ত রয়েছে। এমতাবস্থায় এখানকার সাধারণ দ্বীনী পরিবেশ খুব বেশী প্রভাবান্বিত হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু ইহা ইসলামেরই মোযেজা যে, হাজার চেষ্টার পরও অন্তর থেকে ঈমান মুছে ফেলা সম্ভব হয়নি। মসজিদসমূহ এখনও আবাদ আছে। লোকদের মধ্যে শুধু নামায রোযারই নয়, বরং দ্বীনী কথা শ্রবণ করার এবং ধর্মীয় সমাবেশে বসার যথেষ্ট আগ্রহ রয়েছে। নারীদের থেকে জোরপূর্বক ওড়না নামিয়ে ফেলার আন্দোলন সরকারীভাবে শুরু করা হয়। কিন্তু তারা বিরাট অংশে ব্যর্থ হয়। এখনও দিমাশকের সড়কগুলোতে ওড়নাই শুধু নয় বরং যথানিয়মে ঐতিহ্যবাহী বোরখাও বিরাট সংখ্যক মহিলার গায়ে পরিলক্ষিত হয়।

যেসব আলেম এখনও সিরিয়ায় অবস্থান করছেন তাঁদের বর্তমান কর্মকৌশল হল, তাঁরা রাজনীতি থেকে সম্পূর্ণরূপে পৃথক হয়ে নিখাদ তালীম এবং তাবলীগের কাজে লিপ্ত রয়েছেন। বর্তমান অবস্থাতে একমাত্র এই কর্মকৌশলের মাধ্যমেই এখানকার মুসলমানদের দ্বীন এবং ঈমান সংরক্ষণ করা সম্ভব হবে। যদিও প্রাচীন দ্বীনী মাদ্রাসাসমূহ সব বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে এবং নিয়মিত ধর্মীয় শিক্ষা শুধুমাত্র কলেজ এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামী জ্ঞান এর শাখায় অর্জন করা সম্ভব। তবে প্রথমতঃ সেসব কেন্দ্রে কোন কোন শিক্ষক অত্যন্ত কঠোর এবং দৃঢ় যোগ্যতাসম্পন্ন বর্তমান আছেন, দ্বিতীয়তঃ বিভিন্ন আলেম তাঁদের

মসজিদে বা ঘরে ব্যক্তিগতভাবে ধর্মীয় শিক্ষার ধারা চালু রেখেছেন। ফলে ইসলামী জ্ঞানের অনুশীলন সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হতে পারেনি। আলেমগণ ধর্মীয় বিষয়ের উপর বিভিন্ন গ্রন্থও লিখছেন এবং তা অনেকটা স্বাধীনভাবে প্রকাশও করছেন।

বিধায় সেখানকার সার্বিক পরিস্থিতি অবশ্যই দুঃখজনক, তবে নৈরাশ্যজনক নয়। বাতিলের জোর জবরদস্তি একদিন না একদিন খতম হয়ে যাবেই ইনশাআল্লাহ এবং আলমে ইসলামের জান্নাততুল্য এই ভূখণ্ড তার হৃত ঔজ্জ্বল্য ও গৌরব পুনরায় ফিরে পাবে ইনশাআল্লাহ।

সমাপ্ত